মোহিনী।

উপন্যাস।

শ্রীরাধানাথ মিত্র দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চাটুর্য্যের লেন হইতে
মিত্র এণ্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
দি ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্ হইতে
শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

মোহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৃতীয়শ্রেণীতে পঠদ্দশায় নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথের ভগ্নীগণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা এক্ষণে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছে। নগেন্দ্রের পিতা চন্দ্রনাথ বসু, বধূমাতাকে বড়ই ভাল বাসেন, তিনি পুত্রবধূকে প্রায়ই নয়নের অন্তরালে রাখেন না। বাল্য-প্রণয়ে নগেন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইয়া মনের আনন্দে দিন যাপন করেন। একমাত্র বসুজা মহাশয়ের উপার্জ্জনেই তাঁহার পোষ্যবর্গ প্রতিপালিত হয়। চন্দ্রনাথ সামান্য চাকরি করিতেন, স্বল্প আয় হেতু তাঁহার কিছুতেই সঙ্কুলান হইত না, তিনি পরিশ্রমে একদিনের জন্যও নিবৃত্ত থাকেন নাই।

নগেন্দ্র ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত চন্দ্রনাথকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। একদিকে সংসারের পোষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ উত্তরোত্তর খরচ পত্র বাড়িতেছে, অন্যদিকে বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে সমস্ত ব্যয়ভারে নগেন্দ্রনাথের বিদ্যা উপার্জ্জনে নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটিতেছে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নগেন্দ্রনাথ কোন পথ অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

লেখাপড়ায় সংযত থাকিয়া উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটে; এরূপ অবস্থায় বিপন্ন পিতার গলগ্রহ হইয়া সংসারধর্ম্ম

নির্ব্বাহ কারণ নগেন্দ্রনাথের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল, অথচ স্নেহময় পিতা অতি কষ্টে পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিতেছেন, সংসার সমাজ সকলদিক রক্ষা করিয়া তাঁহাকে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইতেছে, নগেন্দ্রনাথ উপযুক্ত সন্তান হইয়া পিতাকে এখনও সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, যতই পুত্র এবম্বিধ পিতার কষ্টের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দিনে দিনে লেখা পড়ার প্রতি অনুরাগ ততই তাঁহার হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় নগেন্দ্রনাথ অধ্যয়নে জীবনের উন্নতি সাধন, আর মঙ্গলপ্রদ বিবেচনা করিলেন না। অথচ পিতা, পুত্রকে সংসারের অভাবের কথা একদিনের জন্যও শুনান নাই, পিতার মনোগত অভিপ্রায় না জানিয়া নগেন্দ্র কোন পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ জন্য যে পিতাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা তাঁহার সম্যক উপলব্ধি হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথের ছয় বৎসর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পত্নী শান্তকুমারীর এখন বৎসরের অধিকাংশ সময় শ্বশুরালয়েই কাটিয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীকে আদর যত্ন করিতে কোন অংশে ক্রটী করেন না, শান্তকুমারীও স্বামীকে আরাধ্য দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, উভয়েই উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইয়া সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না, মনের আনন্দে কাল যাপন করেন। বিংশ শতাব্দীর বিলাসিনী রমণীদিগের ন্যায় শান্তকুমারীর বেশবিন্যাস বা অঙ্গশোভার প্রতি আদৌ দৃষ্টি ছিল না, কোন গতিকে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলেই রমণী আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। গুণগ্রাহী বসুজা মহাশয় বধূমাতাকে গৃহে রাখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট থাকিতেন।

চন্দ্রনাথের কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই, শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহাকে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে।

নগেন্দ্রনাথ এখনও পঠদ্দশায় রহিয়াছেন, তাহাতে সংসারে সাহায্য করা দূরে থাকুক, প্রতিমাসেই তাঁহার জন্য বসুজা মহাশয়ের দশ বার টাকা ব্যয় হইতেছে, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হইলেই সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, অভাব প্রযুক্ত পরস্পর বিরোধের সূত্রপাত হইয়া উঠে। বুদ্ধিমতী শান্তকুমারী উত্তরোত্তর সংসারের বিকৃত অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়া এক দিবস স্বামীকে মনোগত অভিপ্রায় জানাইতে প্রয়াসী হইলেন।

পতির চিত্তরঞ্জন ভিন্ন সাধ্বী সতীর অন্য কামনা কিছু না থাকিলেও শ্বশুর শাশুড়ী সংসারের ব্যয়ভারে দিন দিন প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছেন, এজন্য সময়ে সময়ে বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে লক্ষ্য করিয়া, শান্তকুমারী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে তাঁহার এখনও লজ্জা করে। গভীর রজনীতে জগৎ নিস্তব্ধ মুর্ত্তি ধারণ করিলে, বসুজা মহাশয়ের অন্যান্য পরিজনবর্গ নিদ্রিত হইলে, স্বামীর সহিত শান্তকুমারীর সঙ্গোপনে কথা কহিবার সাবকাশ হয়, সংসারের ভাবগতি দেখিয়া সরলার সরল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে, জীবনে পতিকে উপ-দেশচ্ছলে কখন কোন কথা কহিবেন না, মনে মনে স্থিরসঙ্কল্পা হইলেও অদ্য যুবতী সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে উদ্যোগী হইয়াছেন।

যথা সময়ে সংসারে রাত্রির কাজ কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, পরিজনবর্গ আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত মনে যে যাহার কক্ষে শয়ন করিয়াছে, নগেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা-গৃহ হইতে এখনও শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শান্তকুমারী শান্তিময়ী নিশিথিনীর সুদীর্ঘ সাবকাশে দৈনিক শান্তিলাভ আশায় শয্যায় শায়িতা হইয়াও, প্রতিক্ষণে নগেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, পতিপ্রাণা মনের উদ্বেগ পতিসকাশে প্রকাশ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি সম্পাদন করিবেন, এই আশায় পতির অপেক্ষা করিতেছেন, অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিতে বিলম্ব হইতেছে, শান্তকুমারীর চক্ষে নিদ্রা

নাই, যুবতী আপনার ভাবেই বিভোরা, এমন সময়ে নগেন্দ্রনাথ শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রতি রজনীতে নগেন্দ্রনাথ যে সময়ে গৃহে আসেন, সে সময়ে শান্তকুমারী গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা থাকেন, নগেন্দ্র সহধর্ম্মিণীর জাগ্রত ভাব দেখিয়াই মনে মনে অনুমান করিলেন, বিশেষ কোন প্রয়োজনেই পত্নী এখনও নিদ্রা যান নাই। যুবক সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্ত! এখনও যে জাগিয়া রহিয়াছ?"

শা। তোমার আগমন প্রতীক্ষায়।

ন। আমি এ সংবাদ পূর্ব্বে পাইলে, আসিতে এত বিলম্ব করিতাম না।

শা। আমার জন্য তোমার কোন কার্য্যে বিঘ্ন হয়, তুমি জানত, তাহা আমার ইচ্ছা নহে।

ন। সে কথা সত্য বটে,—এখন তোমার অভিপ্রায় কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

শা। তোমার ভালয় আমার ভাল, দেখ—সংসারে দিন দিন খরচ পত্র বাড়িতেছে, ঠাকুরের কোন কাজ কর্ম্ম নাই, পোষ্য সংখ্যাওত কম নহে, এরূপ অবস্থায় আমার বিবেচনায় তুমি তাঁহার কতক সাহায্য করিতে পারিলে, সংসার লইয়া তাঁহাকে এরূপ বিব্রত হইতে হয় না। ভাবিয়া দেখিলে এখন সংসারের সকল ভারই তোমার—তাঁহার নহে। ঠাকুর আর কত দিন সংসার লইয়া থাকিবেন, এখন তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের সময়; কিন্তু আমরা তাঁহার পায়ের বেড়ি, আমাদের মুখ চাহিয়া তিনি সংসারের জন্য সদাসর্ব্বদা ভাবিত থাকেন, ইহাতে তাঁহার কর্ম্মের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে; এ সময়ে তোমার উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টির প্রয়োজন হইতেছে, নতুবা সংসার ধর্ম্ম আর রক্ষা হয় না।

ন। শান্ত! তোমার কথায় আজ আমার যেন চৈতন্য হইল, সময়ে সময়ে সংসারের বিষয় ভাবি বটে, কিন্তু সকল সময়ে নহে। আমার দ্বারা

কর্ত্তার কি সাহায্য হইতে পারে? আমার জন্য তাঁহাকে মাসে মাসে কত খরচ বহন করিতে হয়, বুঝিয়া দেখিলে—বাস্তবিকই এ সময়ে তাঁহাকে অর্থের জন্য পীড়ন করিয়া অনর্থক কষ্ট দিয়া থাকি।

শা। আমিও তাই বলিতেছিলাম, তিনি বৃদ্ধবয়সে যদি আমাদের ভাবনাই ভাবিতে থাকিবেন, তবে আর নিশ্চিন্ত হইবেন কবে?

ন। এখন উপায় কি? আমাদের ভরণ পোষণ জন্য তাঁহাকেত প্রতি মাসেই খরচ করিতে হইতেছে। তবে কি আমি লেখা পড়া ত্যাগ করিব?

শা। আমি স্ত্রীলোক, ভাল মন্দের বিচার শক্তি আমার নাই। মনের ভাব তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, এখন উচিতানুচিত তুমি ভাবিয়া দেখ।

ন। তুমি আমায় বিষম সমস্যায় ফেলিলে, এক দিকে সংসার ধর্ম্ম, অন্য পক্ষে জ্ঞানোপার্জ্জন। ইহার ত্যজ্য পূজ্য আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

শা। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি বুদ্ধি শুদ্ধি হীন—স্ত্রীলোক মাত্র, আমার যদি হিতাহিত বিচারের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে অভিপ্রায় মত কার্য্য করিবার জন্য, হয়ত এক দিন তোমায় অনুরোধ করিতাম।

ন। শান্ত! তুমি আমার সংসারসঙ্গিনী—আশা ভরসা, তোমার অবলম্বনেই আমার সংসার ধর্ম্ম, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হইলে—জগৎ সংসার আঁধার দেখিতে হইবে। দেখ, ওসকল কথা রাখিয়া দাও, আমি তোমার ভাবগতি বিলক্ষণ জানি, আর আমায় বঞ্চনা করিও না, সদ্যুক্তি চাই। আমার হৃদয়ে বল দাও, আমি তোমার বলে বলী হইয়া—কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

শা। দেখ—তুমি কায়া, আমি ছায়া, ছায়ার অবলম্বনই তুমি, তোমার মুখে ওরূপ কথা শুনিলে আমি প্রাণে ব্যথা পাই। যদি আমার কথায় তোমার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, দাসী জ্ঞানে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

ন। সরলে! তোমার সরল কথায় আমার হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আমি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না! তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার যুক্তিতে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, প্রকৃতই আমি এতদিন জড়ের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া কালাতিপাত করিয়াছি। সংসারে যে জন্য মনুষ্যজীবন লাভ করিলাম, ভাবিয়া দেখিলে—জানিতেছি আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই। বৃদ্ধ পিতা সংসার ভারাক্রান্ত হইয়া গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতেছেন, আর আমি নিশ্চিন্তে বসিয়া বৃদ্ধের বহু কষ্টের অর্জ্জিত অন্ন ধ্বংশ করিতেছি মাত্র। আমার মত স্বার্থপর মহাপাতকী নারকী এ জগতে আর কে আছে? ধিক আমার জীবনে, ধিক আমার জ্ঞানোপার্জ্জনে।

শা। কোন কার্য্যে এক কালে উতলা ভাব ধারণ করিলে, তাহা সুচারু রূপে প্রায়ই সম্পাদিত হয় না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, গত বিষয়ের আন্দোলনে কেবল হৃদয় ব্যথিত হয় মাত্র। তুমি জ্ঞানবান, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে, সংসার ধর্ম্মেও কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবে না।

ন। আজ হইতে আর আমি পিতার গলগ্রহ হইব না, যে কোন উপায়ে হউক, সংসারে সাহায্য করিতে সযত্ন হইব। কিন্তু যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে পরের পয়সা ঘরে আনা বিষম সমস্যা। বাল্যকালে যখন লেখা পড়ায় নূতন ব্রতী হইলাম, তখন মনে মনে কতই উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমার সে সকল উচ্চ কল্পনা একে একে দূরে দাঁড়াইতেছে—সংসারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন আমার পক্ষে আকাশ কুসুম বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে—জানি না পরিণামে আমার অদৃষ্টে কি দাঁড়াইবে। শান্ত! ভবিষ্যতের পথ নিবিড় অন্ধকারময়, যতক্ষণ না কার্য্যসূত্রে সেই স্থানে উপস্থিত হই, সে সময়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই।

শা। উপস্থিত মতে অগ্র পশ্চাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ব্যক্তি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহারই নাম সংসারে থাকিয়া যায়।

ন। ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনায় আর প্রয়োজন নাই, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে; আমি এক্ষণে উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিব, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সংসার বন্ধনে আর উদ্বিগ্ন করিব না। যাঁহাদের অনুগ্রহে এই দুর্ল ভ জীবন লাভ করিলাম, যাঁহারা ভরণ পোষণ করিয়া আমাকে সংসারী করিয়াছেন, যাঁহাদের কৃপায় আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি, এখনও সংসার ভারে তাঁহাদিগকে জড়িত রাখিলে, আমাকে ঈশ্বরের নিকট গুরুতর অপরাধী হইতে হইবে। সে মহাপাপেরত প্রায়শ্চিত্ত নাই। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, একত্র সম্মিলনে সংসার। হিন্দুর গৃহে এই একতা বন্ধন বজায় রহিয়াছে বলিয়াই জগতে হিন্দুধর্ম্মের এত মাহাত্ম্য; তাই হিন্দুগৃহ জগতের আদর্শ স্থল।

শা। তোমাকে আমার কোন কথা কহিবার অধিকার নাই, তুমি স্বামী—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—সেবাদাসী মাত্র। ভাল মন্দের বিচার শক্তি সকলই তোমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সদ্বিবেচনায় যাহা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিবে, সেই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও—ইহাই আমার আকিঞ্চন।

ন। শান্ত! তোমার ঋণ আমি ইহ জন্মে শোধ করিতে পারিব না। তোমার কথায় আমার মনে যেন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। তুমি আমার সংসার-সঙ্গিনী—আশা ভরসা—ঈশ্বর করুন যেন চির দিন এই ভাবে যায়।

স্বামী স্ত্রীর এইরূপ কথা বার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দিবা ভাগের পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিলেন, কথা প্রসঙ্গে জাগ্রত থাকিলেও প্রতি মুহূর্ত্তে শান্তির অপেক্ষায় দুই জনেই আলস্য

বোধ করিতেছিলেন, নিদ্রাদেবী দম্পতীকে ক্রোড়ে লইবার জন্য সন্নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, উভয়ের কথোপকথনের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী তাহাদের অজ্ঞাতসারে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাত্রির অবশিষ্ট সময়ের জন্য শান্তিবারি সিঞ্চন করিলেন। যুবক যুবতী সুনিদ্রায় অভিভূত হইয়া সংসারের পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা ভাবনা চিন্তা আদি ব্যাধি সকল বিভীষিকার প্রহেলিকা হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য অব্যাহতি লাভ করিল। এতক্ষণ সংসারের কথা লইয়া উভয়ে মনে মনে যে কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন, ক্ষণ মধ্যে তাহার আর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কিছুরই স্থিরতা নাই, তথাচ যে যত দিন বাঁচিয়া থাকে, ভবিষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হয়। সংসারব্রত পালনে যে সক্ষম, সেই কৃতী—সে সুখ কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। মানুষ জন্মিলেই মরিবে—অবধারিত রহিয়াছে, কিন্তু কখন কাহার দিন শেষ হইয়া আসিবে, মৃত্যুর পূর্ব্বমূহূর্ত্তে কেহই তাহার নির্ণয় করিতে পারে না, নশ্বর বপুর সুনিশ্চিত লয় জানিয়াও, যে যে কয়েক দিন এ প্রবাসে থাকে, যথাশক্তি কার্য্যে সে স্বীয় পরিচয় প্রদানে প্রয়াসী হয়। সুবিজ্ঞ চন্দ্রনাথ সংসারের পর্য্যায়ক্রমিক সুখ দুঃখ সংঘটনে যথেষ্ট পরিপক্বতা লাভ করিয়াছেন, সংসারধর্ম্মে সকল দিক বজায় রাখিয়া কিরূপে সংসারী হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সম্পদে বিপদে তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া আসিতেছে। জীবনসঙ্গিনী আশা বসুজা মহাশয়ের প্রতি কার্য্যেই

উৎসাহ প্রদান করিতেছিল, চন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সময়ে নগেন্দ্র উপায়ক্ষম হইলে, তাঁহার বর্ত্তমান ভাবনা চিন্তার লাঘব হইবে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে জীবনের অন্তিম কাল সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিবেন; কিন্তু মানুষ মনে মনে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে, কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে—প্রবীণ বসুজা মহাশয়ের এ ধারণাও হৃদয়ক্ষেত্র হইতে এক কালে অন্তর্দ্ধত হয় নাই। তিনি বার্দ্ধক্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের উপার্জ্জনে নির্ভর করিবেন মনে মনে কল্পনা করিতেন, কিন্তু পরক্ষণে সে আশালতা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উন্মূলিত হইত। সংসার সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন বিষয়ে তিনি সমধিক আশান্বিত বা বিচলিত হইতেন না।

নগেন্দ্রনাথ এতাবৎ বিদ্যা উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সংসারের ভাল মন্দ কোন দিকে এক দিনের জন্যও চাহিয়া দেখেন নাই; পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী পরিজনবর্গ মিলিত থাকিয়াও তাঁহার সংসার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সংসারের অভাব মোচনে বসুজা মহাশয়ের দৃষ্টি থাকায়, নগেন্দ্রনাথ পঠদ্দশায় অসংসারীর মত দিনাতিপাত করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যে দিন হইতে তাঁহার দারপরিগ্রহ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তিনি সংসারী হইয়াছেন। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় পরের পয়সা ঘরে আনিতে তিনি সক্ষম নহেন, অথচ কথঞ্চিৎ তাঁহার ব্যয় বাড়িয়াছে। সামান্য কারণে স্বল্প দিনে তিনি অর্থের অনটন উপলব্ধি করিলেন, মাতামহীর জীবদ্দশায় নগেন্দ্রনাথের যখন যাহা প্রয়োজন হইত, বৃদ্ধা তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেন, নগেন্দ্রনাথ সেই স্নেহময়ীকে জন্মের মত হারাইয়া পদে পদে মনক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন, নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আবশ্যক হইলেও তিনি পিতার নিকট সে কথা জানাইতে কুণ্ঠিত

হইতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথ এতাবৎকাল পিতার গলগ্রহ রহিয়াছেন, তাহাতে বসুজা মহাশয়ের সংসার খরচ দিন দিন বাড়িতেছে, এরূপ অবস্থায় নগেন্দ্র আপনাকে বিপন্ন ভাবিলেন, সংসার সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা না থাকিলেও অর্থাভাব তিনি পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলেন, পঠদ্দশার প্রারম্ভে নগেন্দ্রের মনে কত উচ্চ আশা ছিল, সময়ে তিনি মান্য গণ্য ও ধনশালী হইবেন, কতই মহতী আশার আশায় ভিত্তি স্থাপন করিয়া তিনি উৎসাহ-স্রোতে ভাসিয়াছিলেন, সংসারের আন্দোলনে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী পুনঃ পুনঃ বিলোড়িত হওয়ায়, তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূলিত হইতে বসিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থানটনের বিভীষিকা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। সরল চিত্তে যখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সহজে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে—এ কারণ সুকুমারমতি বালক বালিকা অল্প দিনে যে শিক্ষা লাভ করে, বয়োবৃদ্ধিতে সে সুলভ শিক্ষা হয় না। নগেন্দ্রনাথ সংসারের খরচপত্রে এতাবৎ কাল আদৌ বিচলিত হন নাই, নিজের লেখা পড়া লইয়া ছিলেন, সংসারী হইয়া অর্থাভাবে দিনে দিনে তাঁহার চিত্তবিকৃতির সূত্রপাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যালাভে ব্যাঘাত ঘটিল।

শান্তকুমারী স্বামীকে জগতের আরাধ্য দেবতা বলিয়াই জানিতেন; পতি যাহাতে মনে ব্যথা পান, কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না; সংসারে থাকিতে হইলে, কথা বার্ত্তায় সুখ দুঃখের কত মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে, পতিব্রতা নিজগুণে সে সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিতেন, কখন কিছুতেই তিনি বিচলিত হইতেন না, একারণ পত্নীর সুখ দুঃখে নগেন্দ্রনাথকে কোন প্রকার সহানুভূতি দেখাইতে হয় নাই, তথাচ সামান্য কারণে নগেন্দ্র ক্ষণে ক্ষণে চিত্তশান্তি হারাইতে লাগিলেন, নগেন্দ্রনাথের হৃদয়প্রবাহ যে ভাবে ধাবিত হইতেছিল, সংসারের নিত্য নূতন

চিন্তাধিকারে তাহার ভাবান্তর ঘটিল। সুবিজ্ঞ বসুজা মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নগেন্দ্রনাথের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, তিনি এতাবৎ কাল পুত্রের ভরণ পোষণের সকল ভার নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, তবে নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছামতে সকল সময়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এক্ষণে নগেন্দ্রনাথ কোন বিষয়ের অভাব হইলে, পিতার সম্মুখীন হইয়া তাহা জানাইতে সাহসী হইতেন না, অধিকন্তু বসুজা মহাশয় পুত্রের প্রকৃত অভাব জানিলেও তৎ-পূরণে তাদৃশ মনোযোগী হইতেন না। নগেন্দ্র বুঝিলেন—পিতার গলগ্রহ হইয়া দিনাতিপাত—তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নহে।

পুত্রের পঠদ্দশায় বসুজা মহাশয় সংসারের যাহা কিছু আবশ্যক, তৎ-সমুদয়ে সম্যক দৃষ্টি না রাখায়, শান্তির বিনিময়ে তাঁহার সংসারে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। বসুজাগৃহিণী জ্ঞানদা সুন্দরী বহুপরিবারযুক্ত সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন, এজন্য বসুজা মহাশয়ের সহিত তাঁহার সময়ে সময়ে কথান্তর হইত, চন্দ্রনাথ স্বোপার্জ্জনে সংসারী হইয়াছেন, একারণ কাহারও কোন কথায় তিনি নির্ভর করিতেন না, সংসারে কেহ কোন বিষয়ে যুক্তি প্রদানে উদ্যত হইলে, তিনি উপেক্ষা করিতেন। পরের ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ বিচারে তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া নিজে যাহা ন্যায় সঙ্গত মনে করিতেন, তৎসাধনে কদাচ পশ্চাৎপদ হইতেন না; নগেন্দ্র এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সংসারধর্ম্মে তিনি পিতার দক্ষিণ হস্ত, কিন্তু চন্দ্রনাথের মন্তব্যে নগেন্দ্র পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইতেন, যুক্তির সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে তাঁহার সময় কুলাইত না, অনেক সময়ে পিতার অযুক্তিপূর্ণ বাক্য সূচনায় নগেন্দ্র মনের কষ্ট মনেই সম্বরণ করিতেন।

যে ভাবে সংসার চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে তাহার ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় সহজেই লোকের মনের গতি চঞ্চল হইয়া উঠে, সামান্য কারণে চন্দ্রনাথের যে পুত্র কলত্র সহিত মতভেদ

হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? নগেন্দ্রনাথের এখনও উপার্জ্জনের সূত্রপাত হয় নাই, সে কারণ সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিচলিত হইতে হইতেছে, পিতা সে সকল কিন্তু তাকাইয়া দেখেন না, এই ভাবে যত দিন যাইতে লাগিল, উত্তরোত্তর নগেন্দ্রনাথের শান্তির হ্রাস হইতে লাগিল।

একাগ্রচিত্তে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সময়ে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সে সাধনার পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে, তাহা সহজে সুসম্পন্ন হয় না; নগেন্দ্রনাথের উদ্যম ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই লেখাপড়ায় অমনোযোগ দাঁড়াইল, সুচতুর চন্দ্রনাথ তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিয়াও অর্থাভাবে পুত্রের জ্ঞানোপার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী হইতে পারিলেন না, পিতার শৈথিল্য ভাব পুত্রের অগোচর রহিল না। নগেন্দ্র পিতার অজ্ঞাতসারে মাসিক যাহাতে যৎসামান্য উপায় হইতে পারে, তিনি তাঁহার আবশ্যকীয় অভাব পূরণ করিতে পারেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ বিলাস বাসনার সূত্রপাত হইয়া থাকে, সদা সর্ব্বদা যাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, একত্র সহবাস হয়, অজ্ঞাতসারে তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে, নগেন্দ্রনাথের সহিত ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের আলাপ পরিচয় ছিল, একারণ তাহাদের সংসর্গে দিনে দিনে তাঁহার ভোগবাসনায় অনুরাগ সঞ্চার হইতে লাগিল। আমোদ প্রমোদ পরিশ্রমের লাঘব সাধন করে, অবসন্ন শরীরে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা দিয়া থাকে। কোমল প্রকৃতি আপাততঃ যাহাতে সুখের আস্বাদন পায়, ভালমন্দ না ভাবিয়া তৎভোগে অগ্রসর হইয়া থাকে। নগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন নির্ম্মল ভাবে যাপিত হইয়াছে, যৌবনের প্রারম্ভে সমবয়স্ক যুবকবৃন্দের সহবাসে তাঁহার বিলাস-ভোগ বাসনার সঞ্চার হইল। আজ থিয়েটার, কাল সার্কাশ এইরূপ

এখানে সেখানে নগেন্দ্রনাথের যাতায়াত হইতে লাগিল, চন্দ্রনাথ পুত্রের গতিবিধির প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, নগেন্দ্র আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে—এসংবাদ বৃদ্ধের নিকটে কিছুই অজ্ঞাত রহিল না। দিনে দিনে নগেন্দ্রনাথের সান্ধ্যবিহার, বন্ধুভোজ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। বিলাসভোগে অনুরক্ত হইলে, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনেক সময়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, নগেন্দ্রনাথের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল।

জ্ঞানদা সুন্দরী—পতি পুত্রের মনোভাব সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাচ সংসারে যাহাতে কোন প্রকার অশান্তির সূত্রপাত না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকায়, তিনি একপক্ষে স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে, অন্যপক্ষে পুত্রকে প্রীত রাখিতেন, যাহাতে কোন প্রকার অবহেলা বা অযত্ন না হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। ভবিষ্যতে নগেন্দ্রনাথ জনসমাজে গণ্য মান্য হইবেন, দশজনকে প্রতিপালন করিয়া সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, এই আশায় চন্দ্রনাথ এতাবৎকাল তাঁহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন, স্নেহময়ী মাতার প্রাণে সে উচ্চ আশা গ্রথিত হইয়াছিল, স্ত্রীবুদ্ধিতে জ্ঞানদা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, নগেন্দ্রনাথ পুরুষ মানুষ, তাহাতে লেখাপড়া শিখিতেছে, দশজনের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিতে হইলে—এখানে ওখানে যাতায়াত করিতে হয়, ভাল মন্দ সকল প্রকৃতির লোকের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিতে হয়, এ অবস্থায় নগেন্দ্র সময়ে সময়ে যদি বাটী আসিতে বিলম্ব করেন, সে দোষ ধর্ত্তব্যই নহে। তাহাতে নগেন্দ্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কাহারও মুখে কখনও অপ্রশংসা শুনেন নাই, সামান্য ত্রুটীতে বসুজা মহাশয় পুত্রের প্রতি এককালে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, কটুকথা ও তিরস্কারের কোন অংশে ত্রুটী করেন না। পুত্রের প্রতি পতির ঈদৃশ কঠোর ব্যবহারে জ্ঞানদা সুন্দরী মনে মনে ব্যথিত হইতে

লাগিলেন, তিনি স্বামীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিলে ভয়ে ত্রাসে কোন কথা কহিতে সাহসী হইতেন না; সময়ে বসুজা মহাশয় প্রকৃতস্থ হইলে, পুত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা কহিতেন।

অদ্য নগেন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধবের সহিত বনভোজনে গিয়াছেন। পিতার নিকট এ কথা আদৌ তিনি প্রকাশ করেন নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানদা সুন্দরীই জানিতেন। যথা সময়ে পাঠগৃহে নগেন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ চিত্তে গৃহিণীকে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানদা সুন্দরী স্বামী সকাশে প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিলেন। পঠদ্দশায় পুত্র বন্ধুবান্ধব সহ যখন উদ্যান বিহারে উদ্যোগী হইয়াছেন, সুদীর্ঘ রাত্রি অবধি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের তাঁহার সাবকাশ হয় নাই, এরূপ অবস্থায় তাঁহার লেখাপড়ার অবশ্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। চন্দ্রনাথ পুত্রের ভবিষ্যৎ এককালে তমসাচ্ছন্ন স্থির নির্ণয় করিয়া, নগেন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; পুত্র বাটী ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, তাঁহার কোন সংস্রব রাখিবেন না—মনে মনে স্থির করিলেন, ক্রোধে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। সম্মুখে সহধর্ম্মিণীকে দেখিতে পাইয়া পুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদাসুন্দরী স্বামীকে পুত্রের উদ্দেশে যথেষ্ট কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "নগেন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একদিন বাগানে গিয়াছে, সেখানে তাহাদের খাওয়া দাওয়া হইবে, আমোদ করিয়া আহার করিবে, দশজনে এক সঙ্গে আছে, সমারোহের ভোজে একটু বিলম্বই হইয়া থাকে, এর জন্য এত তিরস্কার কেন?"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "গৃহিণি! তুমি মেয়ে মানুষ, ছেলে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, তা তুমি কি জানিবে? যে ছেলে লেখা পড়ার সময়ে বাগান

বেড়াতে যায়, তার কি আর লেখাপড়া হয়? আমি অনেক দিন থেকে নগেনের উপর লক্ষ্য রেখে আসছি, এক সময়ে আমার আশা ভরসা অনেক ছিল, ভাবিয়াছিলাম—সময়ে নগেন একটা মানুষ হবে, দশজনে তাহাকে মান সম্ভ্রম দেবে; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাহার উপর আমার যে সন্দেহ হয়েছিল, আজ তাহা ঠিক হইল, আমার আশা ভরসা সব শেষ হয়েছে। ছি! ছি! নগেনের জন্য এতদিন যে অর্থ ব্যয় করেছি, সব আমার বৃথা হ'ল। সে হতভাগ্যের নাম করতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "অনর্থক এ সকল কথা বলিবার কারণ কি? নগেনের স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, সকলের মুখে তাহার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাই, একদিন সে যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে আমোদ আহ্লাদে বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব করে, তার উপর এত রাগ করা কি উচিত? দেখ—ঘরে যদি কোন একটা দোষ হয়, তোমার কর্ত্তব্য সেটা সামলে লওয়া। নগেনের সম্বন্ধে তুমি যে রকম আরম্ভ করেছ, তা'তে সে এক দণ্ডের জন্য মনে সুখ পায় না, সদা সর্ব্বদাই যেন বাছা কেমন এক রকম হয়ে থাকে, সারা দিন সে লেখাপড়া নিয়েই রয়েছে—দু দণ্ড স্ফূর্ত্তি না পেলে, সে কেমন করে বাঁচে বল? আর তাহার নেশা ভাঙ্গ ত কিছুই নাই—"

"আর না ঢের হয়েছে—চুপ করে থাক, তোমার কথা আর শুনতে চাই না—তুমিই ছেলেটাকে গোল্লায় দিতে বসেছ—অত আদর দেওয়া নয়, মাথা খাওয়া—যা ইচ্ছে তাই কর, তবে আমি আর সংসারের ভাল মন্দ কোন দিকে তা'কাব না, যা হ'বার তাই হবে।"

"বলি—কথায় কথায় অত রাগ করলে কি সংসার চলে? এক দিন সে বেরিয়েছে, আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমি তাকে বুঝি'য়ে বলব, তুমি কিন্তু কিছু বল না। সে ত এখন আর ছেলে মানুষটী নয়, মান অভিমান, লজ্জা সরম জ্ঞান তার যথেষ্ট হয়েছে—তোমাকে সে খুব ভয় করে।"

"আমি কোন কথাই শুনিতে চাই না—এতদিন যে এত কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শিখাইলাম, সব আমার ব্যর্থ হল, মূর্খপুত্র আর বিধবা কন্যা দুই সমান—নগেনের নাম করলে আমার প্রাণটা যেন জ্বলে ওঠে। যখন ছেলেমানুষ ছিল, কা'র সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ছিল না, বাড়ীর চৌকাঠ থেকে সে বাহিরে যেত না, লোকে তার স্বভাব চরিত্রের কত প্রশংসা করত, কিন্তু আমার ত সে কপাল নয়—দশজনের মুখে পুত্রের সুখ্যাতি শুনলে প্রাণে যে কত আনন্দ হয়, তুমি মেয়েমানুষ তার কি বুঝবে?"

স্ত্রী পুরুষে নগেন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ কত কথাবার্ত্তা কতক্ষণ ধরিয়া চলিল, বসুজা মহাশয় অটল প্রকৃতির লোক, তাঁহার মুখ হইতে যে কথা একবার বাহির হয়, প্রাণপণে তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, জ্ঞানদাসুন্দরী স্বামীর প্রকৃতি ভাল রূপই জানিতেন, পুনঃ পুনঃ কথোপকথনে পতি পুত্রের সমধিক অনিষ্ট ঘটাইবেন, স্থির জানিয়া তিনি কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, চন্দ্রনাথ আপনার মনে পুত্রের উদ্দেশে কতই অশুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আসিতে সমধিক রাত্রি হইয়াছে জানিয়া ভৃত্যের সাহায্যে বাটীতে প্রবেশ করিলেন, অন্তঃপুরে যাইলে জনক জননী অবশ্যই তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, প্রকৃতই তিনি আজি অপরাধী হইয়াছেন, মনে মনে স্থির জানিয়া বৈঠকখানা-গৃহে রাত্রি যাপন করিলেন, সাড়া শব্দে গুরুজনের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে, তাঁহাদের গঞ্জনার আশঙ্কায় তিনি নিঃশব্দে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিবস প্রাতে বসুজা মহাশয় বৈঠকখানা-গৃহে পুত্রকে শায়িত দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে ভৃত্যের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, পরক্ষণে নগেন্দ্র কিজন্য এরূপ বিলম্ব করিয়াছিল, সবিশেষ জানিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে পুত্র এককালে শিহরিয়া উঠিলেন,

কৃত অপরাধের জন্য তিনি পিতৃসমীপে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, অধিকন্তু পুনরায় এরূপ গর্হিত কার্য্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তদুত্তরে চন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিতেছ—তোমার উন্নতি বা অবনতিতে আমার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই—যাহা করিতেছ, না করিতেছ—আমি সকলই বুঝি—কাক প্রাচীরে বসিয়া মলত্যাগ করে, সে ভাবে—কেহ জানিল না, কিন্তু ঠিক জানিও কাহারও তাহা অজানা থাকে না। আমি তোমার ভালমন্দ কিছুই চাহি না, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে—তবে আমাকে ফাকি দিয়া তুমি লেখাপড়ার ভাণে যাহা করিয়া বেড়াইতেছ—তাহা আর চলিবে না। এখন বয়স হয়েছে, নিজে উপায় করিয়া নিজের ভরণপোষণ চালাও, তোমাকে এতদিন খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিলাম, বিবাহ দিলাম—আর আমি বুড়া বয়সে তোমাদের খরচপত্র যোগাইতে পারিতেছি না।"

পিতার কথায় নগেন্দ্র দ্বিরুক্তি করিলেন না, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন—তাঁহার লেখাপড়ার জন্য বসুজা মহাশয় আর এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবেন না। নগেন্দ্রের সুখের দিন শেষ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন যে, অনেকগুলি পোষ্য তাঁহার গলগ্রহ থাকিলেও কোন প্রকারে দিন নির্ব্বাহ হয়, পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কাহারও কোন কষ্ট হয় না। চন্দ্রনাথ যথাক্রমে তিনটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কায়স্থের গৃহে বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদায় অপেক্ষা মহাবিপদ আর নাই, বসুজা মহাশয়ের সঙ্গতিপন্ন অবস্থায় কন্যাত্রয়ের বিবাহ হইলে, তাঁহাকে বিশেষ

বিব্রত হইতে হইত না, কিন্তু তাঁহার উন্নতির অবস্থায় জ্যেষ্ঠা কন্যা মাত্র ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার বিবাহ কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রনাথের অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে, একারণ তিনি মধ্যবিত্ত অবস্থাতেই যথাক্রমে তিন কন্যার বিবাহ দেন, ইহাতেও তাঁহাকে প্রায় চারি সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হয়, এ সকল অতিরিক্ত ব্যয়েও নগেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কোন অংশেই ত্রুটি করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ বাল্যকালাবধি বিশেষ রুগ্ন ও পীড়িত ছিলেন, সময়ে সময়ে যথানিয়মে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, কিন্তু বাটীতে যে শিক্ষক মহাশয় নিযুক্ত ছিলেন, পুত্র তাঁহার নিকট নিয়মিত অধ্যয়ন না করিলেও পিতা পণ্ডিত মহাশয়কে যথানিয়মে বেতনাদি দিতেন।

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় নগেন্দ্রনাথ বৃত্তি লাভ করে, বসুজা মহাশয় পুত্রের লেখাপড়ার উন্নতির জন্য তাহাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া নগেন্দ্রনাথ নীরোগ ও সুস্থ শরীর লাভ করেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এ পরীক্ষাতেও নগেন্দ্র গবর্ণমেণ্টের একটী দশ টাকার বৃত্তি পান। পুত্রের দিন দিন লেখাপড়ায় এরূপ উন্নতি দেখিয়া পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না, পুত্রবৎসল চন্দ্রনাথ নগেন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন, দুই বৎসরে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় নগেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু এবার তাঁহার অদৃষ্টে বৃত্তি জুটিল না। পিতা ভাবিলেন, পুত্র নিয়মিত পরিশ্রম করিয়াছে, অন্যান্য পরীক্ষা অপেক্ষা এল, এ পরীক্ষা দুরূহ, নগেন্দ্র বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু নিস্ফল না হইয়া সে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তাঁহার ইচ্ছা পুত্র বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বয়োঃ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কথঞ্চিৎ বিলাসভোগী হইয়া উঠে, এক সময়ে চন্দ্রনাথের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে নগেন্দ্র লেখাপড়া শিখিয়া উপার্জ্জনে

সংসারের সাহায্য করিবে, বসুজা মহাশয়ের সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। বিষয় কার্য্যে উপার্জ্জিত টাকা প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি কষ্টে লোকালয়ে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, বিজ্ঞতা গুণে আপনার অবস্থা অন্যকে জানিতে দিতেন না। নগেন্দ্রনাথ দিন দিন লেখাপড়ায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, সময়ে সে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইবে, দশ টাকা গৃহে আনিবে, সে সময়ে তাঁহার পুনরায় সুখ-সূর্য্যের বিকাশ হইবে, বার্দ্ধক্যে মনের আনন্দে কাটাইবেন, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া চন্দ্রনাথ পুত্রের জন্য তখনও ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই।

এতাবৎ কাল নগেন্দ্রনাথ যে ভাবে পিতার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে বসুজা মহাশয় পুত্রের কোন অংশেই ত্রুটি দেখিতে পান নাই। অকস্মাৎ বি, এ পরীক্ষার জন্য তাহাকে তাদৃশ উদ্যোগী না দেখিয়া চন্দ্রনাথ মনে বিশেষ ভাবিত হইলেন, উপযুক্ত পুত্রকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না, তিনি যেন কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইলেন।

কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রনাথের পরম বন্ধু, এক পল্লীতেই বাস করেন। বসুজা মহাশয় অকস্মাৎ পুত্রের এরূপ চিত্তবিকারের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তিন চারি দিবস নগেন্দ্রনাথের বিষয়ে মনে মনে আন্দোলন করিলেন, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বসুজা মহাশয় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কেনারাম বাবুর বৈঠক খানায় বসিয়া তুই তিন ঘণ্টা বাক্যালাপে কালক্ষেপ করেন, এক মাত্র কেনারাম বাবু ব্যতীত অন্য লোকের নিকট তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিবার লোক নহেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চন্দ্রনাথ এক দিন কথায় কথায় নগেন্দ্রের কথা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ণগোচর করিলেন।

কেনারাম পল্লীমধ্যে বিষয় সম্পত্তিতে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, দশ জনের নিকটে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম হইয়াছে;

সামান্য অবস্থা হইতে তিনি এক্ষণে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ দিন দিন লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছেন, সময়ে হয়ত সে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে, তিনি উপস্থিতে পল্লীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সময়ে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সে সন্মান উপভোগে প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আসনের অংশীদার হইতে পারে। স্বার্থপর কেনারামের হৃদয়ে অকস্মাৎ এই ভাবের সঞ্চার হইল। বসুজা মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার যে স্বার্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, এ বিষয়ও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাচ পুত্রবৎসল পিতা মনের উদ্বেগে নগেন্দ্রনাথের মঙ্গল কামনায় তাহার ভাবান্তরের কথা সবিশেষ উল্লেখ করিলেন। সে দিন কেনারাম চন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ নগেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইল আদ্যোপান্ত শুনিলেন বটে, কিন্তু নিজ মন্তব্য অপ্রকাশ রাখিলেন। সরলপ্রকৃতি বসুজা মহাশয় কেনারামের কোন সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় সন্দিগ্ধ হইলেন, কিন্তু মনের কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা গোপন করিবার আর কোন উপায় নাই জানিয়া, তিনি মনের উদ্বেগ মনেই রাখিলেন, আর কাহাকেও কোন কথা ব্যক্ত করিলেন না।

কেনারাম গৃহস্থের সন্তান হইয়া নিজ বুদ্ধিবলে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, লোকের সহিত মিষ্টালাপে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় নাই। আলাপ পরিচয়ে তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য। সকলেই তাঁহাকে মান্য করে, দশের নিকট তাঁহার বিশেষ মান সম্ভ্রমও আছে। চন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ নগেন্দ্রের কথা শুনিয়া তিনি যে কোন উপায়ে হউক নগেন্দ্রের উন্নতির পথে হন্তারক হইতে সচেষ্টিত হইলেন। পর দিবস প্রাতে নগেন্দ্রনাথকে দেখা করিবার জন্য ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন।

নগেন্দ্র কেনারাম বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় ডাকাইয়া পাঠাইবা মাত্র নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কেনারাম বাবু নগেন্দ্রকে দেখিবামাত্র সাদর সম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার কথায় উত্তর করিলেন "আজ্ঞে সমস্ত মঙ্গল! তবে কয়েক দিন হইতে মন কিছু চঞ্চল হইয়াছে, যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

কে। কেন? এ সময়ে মন খারাপ হইবার কারণ কি?

ন। মহাশয়! আপনিত জানেন, আপনার নিকট গোপন বা অপ্রকাশ রাখিবার আমাদের কিছুই নাই।

কে। সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু তোমার বাবা সে দিন কথায় কথায় তুমি লেখাপড়ায় এখন অযত্ন করিতেছ বলিয়া বিস্তর আক্ষেপ করিলেন, তাই তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি ডাকাইয়াছি। আচ্ছা, তুমি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইতেছ কেন?

ন। আপনি যখন সবিশেষ জ্ঞাত আছেন, তখন আর আপনাকে এ বিষয়ে কি জানাইব? সংসারের অভাবই আমার মনোবিকারের মুখ্য কারণ।

কে। কেন? তোমার বাবাত খরচ পত্র দিতে কাতর নহেন! তবে তুমি লেখা পড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতেছ কেন?

ন। মহাশয়, দিন দিন পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, বাবা সংসার চালাইতেছেন বটে, কিন্তু কি কষ্টে যে দিন যাইতেছে, তাহা আপনাকে আর কি জানাইব। এখন আমার লেখাপড়ার জন্য যদি তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয়, আমার বিবেচনায় তাহা আমার পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। আর যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যে লেখাপড়া শিখিয়াছি বলিয়া ভাল চাকরী পাইব, তাহারও কোন আশা ভরসা দেখি না। যে কোন উপায়ে হউক এখন দশটাকা আনিয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারিলে,

আমার বিবেচনায় সংসারের অনেক উপকার হইতে পারে, এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি?

সুচতুর কেনারাম নগেন্দ্রনাথের মনোভাব পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজমুখে তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "নগেন্দ্র! তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। তুমি তোমার বাবার উপযুক্ত পুত্র, বসুজা মহাশয় এক্ষণে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তোমাদের ভরণ পোষণ জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে কাটাইতে হইতেছে, এ সময়ে তুমি সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিলে, কতক অভাব নিবারণ হয়; কিন্তু সহসা একটী ভাল চাকরী যোগাড় কিরূপে করিবে? আমার সঙ্গে পূর্ব্বে অনেক লোক জনের আলাপ পরিচয় ছিল, তাহারা এখন কে কোথায় তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। তুমি যখন মনে মনে এরূপ যুক্তি করিয়াছ, তখন এ সময়ে তোমার পিতার সাহায্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাই আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য।"

নগেন্দ্রনাথ কেনারাম বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। স্বার্থপর কেনারাম নগেন্দ্রের উন্নতির পথ রোধ করিতে যে কল্পনাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, যুবকের সহিত কথা বার্ত্তায় তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি এক্ষণে মনে মনে এ বিষয়ে সমধিক অনিষ্টের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, এক দিনের জন্যও সহধর্ম্মিণীর সহিত তাঁহার মনান্তর হয় নাই, সাংসারিক ঘটনা চক্রে উৎ-পীড়িত হইলে, তিনি পতিপ্রাণা প্রণয়িনীর নিকট শান্তি লাভ করিতেন, কিন্তু কয়েক মাস গত হইল অভাগা গৃহশূন্য হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছে। কাজ কর্ম্ম কিছুতেই তাঁহার মন সংযোগ হয় না, সংসার তাঁহার পক্ষে নিবিড় অরণ্য প্রায় বোধ হইতেছে। সহধর্ম্মিণীর জীবদ্দশায় তিনি যে সকল বিষয়ের জন্য কদাচ ভাবিতেন না, এক্ষণে অহোরাত্র সেই সকল দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। নগেন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিজনবর্গ সকলেই রহিয়াছেন, সকলেরই সহিত তাঁহার পূর্ব্বভাব বজায় রহিয়াছে, কিন্তু প্রণয়িনীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া তাহার মনের যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অভাগা যে কি দারুণ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে—তাহা সে স্বয়ং বুঝিতে অক্ষম, অন্যে সে ব্যথার ব্যথী হইয়া তাঁহাকে আর কি শান্ত করিবে!

পিতা মাতা ভাই ভগ্নী পুত্র কলত্র বন্ধু পরিজন মিলিত হইয়া লোকে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীর জীবদ্দশায় সে সুখসম্ভোগে পরমানন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন, এখন হতভাগ্যের যে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, সে দারুণ মনোবেদনা সে কখন কল্পনায় ভাবে নাই, আত্মীয় পরিবারবর্গ সকলের বিদ্যমানে একমাত্র ভার্য্যার অভাবে তাঁহার আশা ভরসা সকলই যেন এককালে লোপ পাইয়াছে। যুবক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া পরম উৎসাহ ও অনুরাগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রতি তাঁহার কখন ঔদাস্য ছিল না, কিন্তু যে দিন তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী ইহজীবনে ধিক্কার দিয়া পরলোকগতা

হইয়াছেন, সেই দিন হইতে সেই শক্তিহারা হইয়াই জন্মের মত তিনি সকল শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ এক্ষণে সতত অন্যমনস্ক, একদণ্ড একস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেও তাঁহার যেন কষ্ট বোধ হয়, কোন কার্য্যে সংযত না থাকিলেও তাঁহার চিত্ত সদাই যেন অস্থির থাকে।

একত্র বাসে আজ কাল বরদার সহিত নগেন্দ্রনাথের বিশেষ সদ্ভাব। নগেন্দ্র নাথ পূর্ব্বে বরদার সহিত তাদৃশ আলাপ করিতেন না বা সর্ব্বদা বেড়াইতেন না; কিন্তু গৃহশূন্য হওয়া অবধি পল্লীস্থ যুবকবৃন্দের মধ্যে নগেন্দ্র, বরদাকেই পরম সুহৃদ ভাবে লইয়াছেন। বরদা ব্রাহ্মণ সন্তান, পল্লীগ্রামবাসী; সম্প্রতি জনৈক ধনাঢ্য আত্মীয়ের অনুগ্রহে ও আনুকূল্যে কলিকাতায় নগেন্দ্রনাথের পল্লীতেই এক খানি বাটী প্রস্তুত করাইয়াছেন, কেরাণীগিরি কার্য্যে যোগেযাগে তাহার দিন যাপন হয়। কার্য্য-স্থান হইতে অবসর পাইলে, বরদা এখানে ওখানে গান গল্প ও তামাকু সেবন করিয়া দিন কাটায়, কাহারও বাটীতে কোন কাজ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, যথাসাধ্য অধ্যক্ষতার ভার লয়। একে ব্রাহ্মণ. তাহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকায়, প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া কলাপ উপস্থিত হইলে, বরদাকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দেওয়া হয়, এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বরদা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। বয়সে নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইলেও বিষয় বুদ্ধিতে বরদা নগেন্দ্রের অনেক বিষয়ে শরণাগত. বাল্যকাল হইতেই. বরদা লেখা পড়ায় মনোযোগ দেয় নাই, আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিয়াছিল, সহায় সম্পত্তি বরদার বিশেষ কিছুই ছিল না, তথাচ তাহার প্রধান গুণ এই যে, সকল প্রকার লোকের মেজাজ সে বুঝিতে পারে এবং কাহার সহিত কিরূপ ভাবে আলাপ পরিচয় করিতে হয়, সবিশেষ জানে। একারণ বরদা বিষয় বুদ্ধিতে সুবিজ্ঞ না হইলেও যে কেহ কোন কার্য্য বশতঃ তাহার সংশ্লিষ্ট হয়,

সে তাহাকে আদর যত্নের কোন অংশেই ত্রুটি করে না। প্রত্যক্ষে এরূপ সম্বন্ধসূত্রে বরদার লভ্য না থাকিলেও, এই সকল লোকের নিকট বরদা সময়ে সময়ে উপকার পাইয়া থাকে।

যতক্ষণ না লোকের মতিস্থির হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ভাল মন্দের বিচার শক্তি লোপ পাইতে থাকে। উপস্থিতে নগেন্দ্র নাথের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উদ্যোগী ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির যাবতীয় লক্ষণে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। লোকের সহিত কথা বার্ত্তায় পরিতৃপ্তি লাভেও সময়ে সময়ে তাঁহার বিরক্ত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, অথচ নির্জ্জনে একাকী থাকিয়াও নগেন্দ্রের তৃপ্তিলাভ হয় না। বরদার সহিত এক পল্লীতে অবস্থিতি কারণ নগেন্দ্রের আলাপ পরিচয় আছে, কিন্তু বরদার স্বভাব চরিত্রে নগেন্দ্রের সামঞ্জস্য ও মিল হয় না। একারণ প্রয়োজন ব্যতিরেকে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটে না।

মদিরাসেবন ও বেশ্যাগমনে নগেন্দ্রনাথের চির বিদ্বেষ; কিন্তু বহু লোকের সহিত আলাপ পরিচয় থাকায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে সকল কাজই করিতে হয়। চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকায় এরূপ সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হইয়াও নগেন্দ্রের স্বভাব কোন অংশে কলুষিত হয় নাই। নগেন্দ্রনাথকে সাতিশয় ম্রিয়মাণ অবস্থায় দিন যাপন করিতে দেখিয়া বরদা নগেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিল, এক্ষণে নগেন্দ্র বরদার সহিত কথোপকথনে কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরস্পর আলাপ পরিচয়ে উভয়ে উত্তরোত্তর সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

নিশাপর্য্যটনে বরদার চির অভ্যাস, পাঁচ সাত দিবস নগেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ পরিচয়ে উভয়ের মনোভাব উভয়ের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। কথায় কথায় এক দিবস বরদা নগেন্দ্রকে সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যাইবার জন্য অভিপ্রায় জানাইল। নগেন্দ্রনাথ গৃহলক্ষ্মীকে

বিসর্জ্জন দিয়া এক দিনের জন্যও মনের সুখ পান নাই, বরদার সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার চিত্তের কথঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছিল, একারণ বন্ধুর উপরোধে নগেন্দ্র কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। বরদা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশেই নগেন্দ্রনাথের সহিত এরূপ মিলিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে নগেন্দ্রনাথকে সম্মত জানিয়া সে মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইল, স্তোক বাক্যে নগেন্দ্রনাথকে বলিল, "ভাই নগেন্দ্র! নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বসিয়া থাকায় তোমার মন দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। দেখ, সংসার ধর্ম্মে সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। গত ঘটনার মনে মনে যতই আন্দোলন করিবে, স্থির জানিও তাহাতে চিত্ত শান্তি লাভ হইবে না।"

ন। ভাই বরদা! তুমি আমায় যাহা বলিতেছ, সকলই যুক্তিসঙ্গত বুঝিতেছি, কিন্তু আমার যেরূপ মনের ভাব হইয়াছে, তাহাতে কাজ কর্ম্ম আর কিছুই ভাল লাগে না।

ব। দেখ, আমোদ প্রমোদ চিত্তবিকারের একমাত্র মহৌষধ, তুমি দিবারাত্রি ঘরে বসিয়া যদি দুঃখের চিন্তায় মগ্ন থাক, তাহা হইলে শান্তি কিরূপে লাভ করিতে পারিবে? মন খারাপ থাকিলে, কোন কাজ কর্ম্মই ভাল লাগে না।

ন। ভাই! আমার চিত্তচাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তন না হইলে যে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কি যেন এক ঘোর অভাব আমাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, আমার এ ভাবের কত দিনে ভাবান্তর হইবে?

ব। আমি তোমার চিত্ত শান্তির জন্যই বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি।

ন। ভাই বরদা! তোমার সহিত আমার অল্প দিনের আলাপ

হইলেও এখন তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে তোমাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়াই আমি মনে মনে স্থির জানিয়াছি। তুমি আমার মঙ্গলের জন্যই আমার প্রতি এরূপ সখ্যতা ভাব দেখাইতেছ। ভাই! তুমি আমায় যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

ব। ভাই নগেন্দ্র! রমণীই সংসার বন্ধনের একমাত্র ভিত্তি, পুরুষ উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কিন্তু গৃহিণী হইতে সংসারধর্ম্ম রক্ষা হয়। ভাবিয়া দেখ, এত দিন যাহার সহিত একত্রে বাস করিয়াছ, তাহার অভাবে তোমার এ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

ন। ভাই বরদা! তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই।

ব। আমি তোমাকে অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য কখনও আকিঞ্চন করিব না। তবে তোমার মন বড় খারাপ রহিয়াছে, যাহাতে তোমার চিত্তশান্তি করিতে পারি, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার সময়ে উভয়ে একত্রে বেড়াইতে যাইব, ভাল মন্দ পাঁচ রকম দেখিতে পাইব, ইহাতে নিশ্চয়ই তোমার মন ফিরিবে।

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বরদা বিদায় গ্রহণ করিল। নগেন্দ্রনাথের সহিত বরদার বিশেষ সৌহৃদ্য না থাকিলেও উপস্থিতে তাহার ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের হৃদয় কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল। নগেন্দ্র ভাবিল, বরদা প্রকৃতই তাহার শুভানুধ্যায়ী, পূর্ব্ব হইতে তাহার সহিত আলাপ ছিল বটে, কিন্তু এক দিনের জন্যও পরস্পরের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, আজ সকল কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। বরদার উপস্থিত ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথ মনে মনে তাহার কত স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু বরদার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল, ঘনঘটায় গগনতল আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে অশনিপাতের বিকট শব্দে ধরণী স্তব্ধভাবাপন্ন, পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত, গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য, মুষলধারে বৃষ্টি ধারা বর্ষিত হইতেছে, একে রাত্রিকাল—তাহাতে জগৎসংসার তিমিরময়, কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, পান্থবর্গ বিপদগ্রস্থ হইয়া যে যাহার গন্তব্য স্থানে সত্বর পাদবিক্ষেপে চলিয়াছে, পথে তাদৃশ জনতা নাই—এমন সময়ে বরদা প্রাণের বন্ধু নগেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইল। বরদা নিশাচর, বাল্যকাল হইতে তাহার স্বভাব কলুষিত হওয়ায়, অপব্যয়ে তাহার অর্থের অনাটন দাঁড়াইয়াছে, সুবিধামত দুই দশ টাকা হস্তগত হইলেই, সে পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া খরচ করে, লোকের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে বরদার চিত্ত বিশেষ প্রফুল্ল হয়, নগেন্দ্রের সহিত একত্র কয়েক ঘণ্টা আমোদ আহ্লাদ করিবার অভিপ্রায়েই এরূপ দুর্যোগেও সে নগেন্দ্রকে ডাকিতে আসিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ নবীন বন্ধু বরদার আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে বরদা আসিয়া দেখা দিল। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও ভ্রমণোদ্দেশে বা অন্য কোন কারণে বরদার সহিত বাটীর বহির্গত হয় নাই, ঝড় বৃষ্টিতেও বরদা কথামত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, একারণ নগেন্দ্র বন্ধুর বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বরদা নগেন্দ্রকে তৎপর হইবার জন্য আকিঞ্চন করিলে, অবিলম্বে নগেন্দ্রনাথ পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বন্ধু সমভিব্যাহারে বাটীর বাহির হইলেন।

উভয়ে কিয়ৎদূর যাইয়াই বরদা এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুর এরূপ ভাবগতি দেখিয়া নগেন্দ্র সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই

বরদা! আসিতে আসিতে তুমি দাঁড়াইলে কেন? তবে কি গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইবে না? দেখ—আমি তোমার কথায় এ ঘোর বর্ষাতেও বাটীর বাহির হইয়াছি, বৃষ্টিধারায় পরিধেয় বস্ত্রাদি সিক্ত হইতেছে, তথাচ তোমার সহিত বেড়াইয়া আজ না জানি কি আমোদ পাইব, এই উৎসাহে আমার মন নাচিয়া উঠিতেছে, কেন ভাই যাইতে যাইতে তুমি থামিলে?"

ব। আমার থামার কারণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে, তোমাকে কথায় ব্যস্ত করিবার আর আমার অবসর নাই। ঐ দেখ—সম্মুখে একটী রমণী আসিতেছে, তুমি কি উহাকে চিনিতে পারিয়াছ?

ন। এ যে দেখিতেছি সুকুমারী এইদিকে আসিতেছে, আমি উহাকে চিনিতে পারিব না কেন, ওযে সময়ে সময়ে আমাদের বাটীতেও যায়, চিঠিপত্র লিখাইয়া লয়। ভাই বরদা, তুমি উহাকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হইলে কেন? আমি তোমার এ কি ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! উহার সঙ্গে আর একটী স্ত্রীলোক রহিয়াছে, ওটী কে?

ব। ওটী উহারই অনুগত, সুকুমারীকে দেখিয়া কি জন্য আমি থামিয়াছি, তোমায় পরে বলিব।

উভয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে সুকুমারী এককালে বরদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে নয়নে নয়নে কি যেন এক ভাবের বিকাশ হইল, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনোভাব যেন ব্যক্ত হইয়া পড়িল। নগেন্দ্রনাথ বিস্ময়াপন্ন নেত্রে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সুকুমারী বরদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "পোড়ার মুখ, বুড় হয়েছ তবু কি তোমার সাধ মিটে না? এত রাত্রে কোন চুলোয় যাওয়া হচ্ছে? ভাল তুমিত অনেক কাল গোল্লায় গিয়াছ, নগেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে আনিয়াছ কেন?"

ব। না, আমরা কোথাও যাইতেছি না, নগেনের মনটা বড় খারাপ আছে, তাই উহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছি।

সু। বেড়াবার দিনই বটে, নগেন বাবু ভাল মানুষ—অতশত বোঝেন না, তাই তোমার কথায় এ দুর্যোগে বাটীর বাহির হইয়াছেন।

ন। দিন দিন আমার মনটা খারাপ হইতেছে, কেন কি জন্য এমন হইতেছে—যতই ভাবিতে থাকি, ততই যেন আমার হৃদয় অধিকতর শোকাচ্ছন্ন হয়, বরদা বাবু আমার মনশান্তির জন্যই বেড়াইতে আনিয়াছেন।

সু। নগেন বাবু! আমিত আপনার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ জানি, আপনার হৃদয় কোমলতায় পূর্ণ, যখন যে কোন দায় দকালে পড়ে, আপনি বুক দিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু ঈশ্বর আপনার যে সর্ব্বনাশ সাধিয়াছেন, তাহাতে আর মন খারাপ হইবে না? আহা বৌত নয়, যেন লক্ষ্মীঠাকুরুণ, আমি আপনাদের পাড়ায় সকল বাটীতেই যাতায়াত করি, সকলের বৌ ঝির সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, সকলেরই ভাব গতি বুঝিয়াছি, কিন্তু বড় বৌ যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। আহা! এক দিনের জন্যও তাঁহাকে একটু বেচাল দেখি নাই। ছেলে পিলের মা হইয়াও তাঁহার যে লজ্জা সরম দেখিয়াছি, লোকের বাটীতে কনে বউ আসিয়াও তেমন ভাব দেখাইতে পারে না; তেমন স্বর্ণপ্রতিমা স্ত্রীকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইহাতে আর আপনার মন খারাপ হইবে না!

সুকুমারীর কথায় নগেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, উত্তরীয় দ্বারা যুবক দুই তিন বার অশ্রুধারা সম্বরণ করিল বটে, কিন্তু সে নয়নাসার কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, এক ধারা মুছিতে না মুছিতে অন্য ধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। নগেন্দ্রের চক্ষে বারিধারা দেখিয়া সুকুমারী কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। নগেন্দ্র বরদার সহিত অন্যমনস্ক ভাবে পথে যাইতেছিলেন, সহসা

তাহার সহিত এইরূপ কথোপকথনে তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, সুকুমারী দুই একটী প্রবোধ বাক্যে নগেন্দ্রনাথের চিত্তশান্তির জন্য সযত্না হইল।

বরদার সহিত দুই একটী কথা কহিয়াই সুকুমারী সঙ্গিনী সহ চলিয়া গেল, বন্ধুদ্বয়ও বিপরীত পথে অগ্রসর হইল। নগেন্দ্র বরদাকে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই বরদা! সুকুমারীর সহিত কি আলাপ পরিচয় আছে?"

ব। আলাপ না থাকিলে কি পথিমধ্যে আমার সহিত সে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে? এক সময়ে অবশ্য আলাপ পরিচয় ছিল, সেই খাতিরে আজও আমার উপর তাহার অধিকার জানায়। কেন? তোমার এ কথা জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় কি?

ন। না, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে, তবে স্ত্রীলোকটী কথা বার্ত্তায় বেশ, লেখাপড়াতেও তাহার বিশেষ যত্ন দেখিতে পাই, সময়ে সময়ে আমাদের বাটীতে যাইয়া বাঙ্গালা গল্পের বহি চাহিয়া লইয়া আসে এবং কড়ার মত ফিরাইয়া দেয়।

ব। নগেন্দ্র! আজ উহাকে পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেছ। এক সময়ে উহার দেউড়ীতে দরবান ছিল; লোকের সব সময় কি সমান যায়? যাহা হউক, সুকুমারী ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা জানে।

ন। ভাই বরদা! তোমার সহিত যখন খোলাখুলি—সকল কথাই হইতেছে, আমার কোন কথা তোমায় গোপন করিবার আবশ্যক নাই। আমাকে এক দিন ঐ স্ত্রীলোকটী বাটীতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল। সময়ে সময়ে দুই একখানা পত্র লিখাইয়া লয় বা দুই একখানা-বাঙ্গালা বহি পড়িতে পায়, এই খাতিরে সে আমাকে বিশেষ মান্য করে। তাহার কথায় আমি যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম,

কিন্তু আমার যাওয়া ঘটে নাই। সুকুমারী আমার যাইতে বিলম্ব দেখিয়া কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী লইয়া স্বয়ং আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমাকে সে গুলি খাইবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু যেরূপ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের আয়োজন ছিল, আমি তাহার যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া, বাটীর বালক-বালিকাদিগকে তাহার সমক্ষেই সে সমস্ত গুলি ভাগ করিয়া দিই। অনর্থক আমার জন্য তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে, একারণ আমি বড় দুঃখিত আছি। আমি একবার ভাবিয়া ছিলাম যে, তাহার বাটীতে যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ছেলে মেয়েদের সন্দেশ খাইতে দুইটী টাকা দিয়া আসিব, কিন্তু একাকী তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হয় নাই, মনের অভিলাষ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছি। একথা কাহারও নিকট প্রকাশও করি নাই, কিন্তু আমি উহার নিকট বিশেষ লজ্জিত আছি।

ব। তুমিও যেমন, এরজন্য আবার লজ্জা কি? তোমার যে দিন ইচ্ছা—উহাদের বাটীতে যাইতে পার, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। তোমার কিছু দিবার ইচ্ছা থাকে, সেই দিনই দিয়া আসিও।

ন। ভাই বরদা! যদি তোমার স্থানান্তরে কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আজই চলনা কেন? আমার সঙ্গে টাকা আছে। বেশ্যার নিকট ঋণগ্রস্থ হইয়া থাকা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। আমি যে দিন তাহার খাবার খাইয়াছি, সেই দিন হইতেই যেন তাহাকে দেখিলে জড়শড় হইতে হয়, মনে মনে কেমন লজ্জা বোধ করি।

ব। ভাই নগেন! তোমাকে লইয়া আমি বেড়াইতে আসিয়াছি মাত্র, তুমি সুকুমারীর বাটীতে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছ, বেশ ত তাহাতে আমার আবার আপত্তি কি?

বন্ধুদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তদ্দণ্ডে সুকুমারীর বাটীর

অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা যেখানে বেড়াইতেছিল, সেখান হইতে সুকুমারীর বাটী অধিক দূরে নহে, সহচরী সহ সুকুমারী বাটীতে প্রবেশ করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই বরদা, নগেন্দ্র সহ তাহার দ্বারে করাঘাত করিল। সুকুমারী স্বয়ং আসিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দিল এবং নগেন্দ্রকে দেখিয়া বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আলোক দেখাইয়া উপরের গৃহে লইয়া গেল। বরদার সহিত তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে, নগেন্দ্র কখন সে বাটীতে প্রবেশ করে নাই, একারণ অভ্যাগতের আদর যত্নের কোন অংশে ক্রটি হইল না। নগেন্দ্র রমণীর ব্যবহারে এককালে বিমোহিত হইলেন।

নগেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতেই সুকুমারী আগন্তুকের জল-খাবারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে সংবাদ নগেন্দ্র বা বরদা পূর্ব্বাহ্নে কিছুমাত্র জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই। কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথাবার্ত্তার পর রমণী, নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অনতি বিলম্বে মিষ্টান্ন পূর্ণ দুইখানি রেকাব লইয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। যেখানিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী সজ্জিত ছিল, সেই খানি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া, অন্য খানি বরদার নিকটে সাজাইয়া দিল। নগেন্দ্রনাথ রমণীর এরূপ ব্যবহার দর্শনে এককালে বিস্মিত বদনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, সুকুমারী নগেন্দ্রনাথকে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া সাদরে জল খাইবার জন্য অনুরোধ আকিঞ্চন করিতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথ রমণীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, নম্রতা সহকারে উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে এরূপ করিয়া লজ্জা দিতেছেন কেন ?"

সু। কেন ? লজ্জার কি কাজ করিয়াছেন ? আপনি আমার কত অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করেন, যখন কোন দায় দকালে পড়ি, আপনার

নিকট যাইলেই আমার আর সে ভাবনা চিন্তা থাকে না। নগেন্দ্র বাবু! আপনি আমার নিকট লজ্জিত হইবেন কি, অনেক বিষয়ে আমি আপনার নিকট লজ্জিত আছি। সে দিন আপনি আমাদের বাটীতে আসিবেন বলিয়াছিলেন, আপনি না আসায় আমরা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম, আজ আমাদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা আর আপনাকে কি জানাইব?

ন। দেখুন, আপনারা আমাকে ভালবাসেন—স্নেহ করেন, সেই জন্যই আমাকে এরূপ বলিতেছেন; কিন্তু আমি মনে মনে স্থির জানি যে, এক দিনের জন্যও আমার দ্বারা আপনাদিগের কোন উপকার হয় নাই। এরূপ ব্যবহার আপনাদের সরলতার পরিচয় মাত্র, সে দিন আমি আসিব—অঙ্গীকার করিয়াও আমার আসা হয় নাই, সে কারণ আমিও মনে ব্যথা পাইয়াছি। আপনার ছেলে মেয়েরা কোথায়?

সু। বড় ছেলেটী এখনও বাটীতে আসে নাই, একে অসুখ তবুত কথা শুনে না, কাজ নাই কর্ম্ম নাই—তবু টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তার কথা আপনাকে আর কি বলিব। আর আর ছেলেরা ঘুমাইয়াছে, বড় মেয়ে ছোট মেয়ে দুই জনেই জাগিয়া আছে, তাহারা ওঘরে রহিয়াছে—আমি তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে বাহির হইতে বলিলাম, কিন্তু তাহাদের এমনই লজ্জা যে, গৃহের চৌকাট হইতেও বাহির হইল না।

ন। সে কথার আমাকে আর পরিচয় দিতে হইবে না, আপনি আজই যেন পথে ঘাটে বাহির হন, কিন্তু এখনও আপনার প্রতি সহসা তাকাইতে লোকের সাহস হয় না, তা তাহারাত আপনার গর্ব্ভজাতা কন্যা, তাহাদের লজ্জা সরম না থাকিবে কেন? মোহিনীকে তখন আমি আমাদের পাড়ায় বেড়াইতে যাইতে দেখিতাম, বালিকা বয়সেও তাহার যেরূপ লজ্জা সরম দেখিয়াছি, এমন কি গৃহস্থের মেয়েও তাহার চলন চালন, ধরণ ধারণ দেখিয়া অনেক শিখিতে পারে

সু। এখন আপনি কিছু জলখাবার খান। বরদা বাবু! তুমি আমার ঘরের লোক, আজ তুমিও যে নগেন্দ্র বাবুর মত হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলে?

ব। আমি তোমাদের ব্যাপার খানা দেখিতেছি। নগেন্দ্র বাবু! আমিত তোমাকে পথেই বলিয়াছিলাম যে, সুকুমারীর কাছে ছাড়ান ছেড়ান নাই, হাত গুটাইয়া আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে? তুমি ভাই খাও, একটা কিছু মুখে দাও, তার পর আমার ব্যবস্থা আমি করিয়া লইতেছি, আমার অত অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন নাই।

ন। বরদা বাবু! তুমি ত জান—আমি আহার করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছি।

ব। আমিই কি ক্ষুধায় অধীর হইয়া পেটে হাত বুলাইতেছি? ভদ্র লোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়—একথাও কি তোমায় শিখাইয়া দিতে হইবে?

বরদার কথায় নগেন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই আহার করিতে বসিলেন।

বরদার সহিত নগেন্দ্র আহার করিতেছেন, সুকুমারী নিকটে থাকিয়া নগেন্দ্রকে 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলিয়া দেখাইয়া দিতেছে, এমন সময়ে দরজার অন্তরাল হইতে একখানি সুন্দর হাত ইঙ্গিত দ্বারা সুকুমারীকে বাহিরে আসিবার অভিপ্রায় জানাইল। রমণী তদ্দণ্ডে গৃহের বাহিরে আসিয়া তাম্বুলপূর্ণ একটী ডিবা লইয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

ন। কে আপনাকে ডাকিতেছিলেন?

সু। আর কে!—মোহিনী।

ন। কেন? আমাদের সম্মুখে বাহির হইতে মোহিনীর এত লজ্জা কেন? যদিও আমি আপনাদিগের বাটীতে আজ নূতন আসিয়াছি, কিন্তু

মোহিনী কি কখন আমায় দেখে নাই? তবে আমাদের দেখিয়া তাহার এত লজ্জা হইতেছে কেন?

সু। সেই জানে। বরদা বাবুর সম্মুখে সে বাহির হয়, তামাক সাজিয়া দেয়—আজ আপনাকে দেখিয়াই তাহার লজ্জা হইয়াছে, আমার বড় মেয়ে বরং কতকটা লজ্জা করে, লোকের সামনে বাহির হয় না, মোহিনী অতশত বোঝে না, লোকের সামনে আসিয়া বসে। আজ তাহার যে কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

উভয়ের এইরূপ কথপোকথনে জল খাওয়া সাঙ্গ হইলে, নগেন্দ্রনাথ তাম্বুল লইয়া মুখশুদ্ধি করিল। বরদাও সঙ্গে সঙ্গে পান খাইল, কিন্তু ধূমপানের জন্য ব্যগ্রতা দেখাইল। সুকুমারী তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহিরে যাইয়া, তামাক লইয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

নগেন্দ্রনাথ পিরাণের জেব হইতে মণিব্যাগ গোপনে বাহির করিয়া দুইটী টাকা লইয়া বালকের হস্তে দিল। রমণী পুত্রের হাতে টাকা দেখিয়া নগেন্দ্রকে বলিল, "নগেন্দ্র বাবু! এটা কি ভাল হইল? আপনি অকারণ কেন অর্থ ব্যয় করিতেছেন, আমার বাটীতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমার মনে যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা কথায় বলিতে পারি না; কিন্তু টাকা দেওয়ায় আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। আপনি টাকা দুইটী তুলিয়া রাখুন।

ন। দেখুন! টাকা ত আমি আপনাকে দিই নাই, বালককে সন্দেশ খাইবার জন্য দিয়াছি, ইহাতে আপনার কোন কথা কহা উচিত নহে। আর এক কথা, আমার কি খাওয়াইতে সাধ হয় না! এই যে আপনি আমাকে দুই দিন ভরপূর করিয়া খাওয়াইলেন, আমি তাহার কি প্রতিশোধ দিলাম?

সু। নগেন্দ্র বাবু! আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনার সহিত তর্ক বিতর্কে জয় লাভ করিবার আমার শক্তি নাই। ভাল, আপনি দিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ করিতে হইল।

এইরূপ কথা বার্ত্তায় রাত্রি অধিক হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথ বাটী যাইবার জন্য বরদার নিকট অভিপ্রায় জানাইলেন। বরদা বন্ধুর কথামত সহাস্য বদনে সুকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। রমণী প্রদীপ হস্তে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথের অনুগামিনী হইল। নগেন্দ্রনাথ সুকুমারীর বিস্তর প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় লইলেন। বন্ধুদ্বয় যে যাহার বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনন্ত জগতে অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত জীব অনন্তময়ের অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সকলই মনুষ্যের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল, যাহার যেরূপ মতিগতি ভগবান প্রত্যক্ষে বা পরক্ষে তাহাকে সেই পথেই লইয়া যান, উন্নতি অবনতি লোকের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল। নরনারী যখন যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি না রাখিয়া অবিমিষ্যকারিতা দোষে অপরাধী হইয়া পরিণামে মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকালে তাহার কোন দিকেই দৃষ্টিপাত হয় না, এই জন্যই সুখস্থলী বসুন্ধরা দিন দিন পাপভারে ভারাক্রান্তা হইতেছে, উত্তরোত্তর অশান্তির বৃদ্ধির সহিত দেশে হাহাকার বাড়িতেছে।

পাথুরিয়া ঘাটায় কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশে সুকুমারীর জন্ম হয়, তারকনাথ ভদ্রের অন্য সন্তান সন্ততি না থাকায়, তিনি কন্যাকে বিশেষ আদর যত্ন

করিতেন, তাহাতে তিনি অতুল ধন সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়ায়, সুকুমারীর বেশ ভূষার জন্য কোন অংশে উপেক্ষা করিতেন না। সুকুমারী এরূপ স্নেহময় পিতার একমাত্র কন্যা হইয়া, অনায়াসে সুখস্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারিত, কিন্তু অভাগিনীর বাল্যকাল হইতেই স্বভাব চরিত্রে চঞ্চল ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। পুত্রীপরায়ণ পিতা মায়াবশে কন্যার অন্যায় ব্যবহারের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাহাতে সুকুমারী বালিকা—বয়স সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া সে এইরূপ চঞ্চলভাব দেখাইয়া থাকে। সময়ে এ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তারক বাবু মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেন।

সুকুমারী সাত বৎসর বয়সে মাতৃহারা হয়, ভদ্র মহাশয় কন্যাকে পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট যত্ন করিতেন, এখন তিনি তাহাকে সমধিক স্নেহ-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, তিনি পুত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়াই সংসারী। দুহিতা পিতার একমাত্র আশা ভরসা, তিনি বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া শুভক্ষণে শুভ দিনে যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, যৌবন বিকাশে সুকুমারীর দিব্য কান্তি উত্তরোত্তর বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তাহার ভুবন মোহন রূপমাধুরী দর্শনে সকলেই মোহিত হইল। সুকুমারীর স্বামী গোলোকচন্দ্র, স্ত্রীর সন্তোষ সম্পাদনে ও প্রীতি-বর্দ্ধনে কোন অংশেই ক্রটি করিত না।

এক দিকে পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, অন্য পক্ষে স্বামীর প্রচুর ভূসম্পত্তি সুকুমারীর সমধিক বিলাস ভোগের কারণ হইয়া উঠিল। যুবতীকে সংসার ধর্ম্ম গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম কিছুই দেখিতে হয় না, রমণী আপনার বেশ বিন্যাস ও অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সরল প্রকৃতি গোলোকচন্দ্র স্ত্রীর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ, যুবতীর চঞ্চল স্বভাবের পরিচয় পাইয়াও তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই।

যে যাহার নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। সুকুমারীর স্নেহময় পিতা, প্রেমিক পতি সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার সে সকল আদর যত্নে মনঃপূত হয় না, কতক্ষণে নিজের অভিপ্রায় মত স্বাধীন ভাব গ্রহণ করিবে, তাহার জন্যই অভাগিনীর উদ্যোগ ও চেষ্টা হইতে লাগিল। সময়ে সুকুমারী গর্ভবতী হইল, পিতা ও পতির আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহারা উভয়েই মনে মনে স্থির করিলেন যে, সুকুমারী পুত্রবতী হইলেই, সংসারের প্রতি তাহার সমধিক অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে, তৎসহ চঞ্চল ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে, কিন্তু অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলাফল ইহ জীবনেই ভোগ করিতে হয়। দুরদৃষ্ট ক্রমে গর্ভবতী অবস্থাতেই সুকুমারী স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইল; যুবতী সৎপথে থাকিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিলে, তাহার অদৃষ্টে কোন প্রকার কষ্ট ভোগেরই সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু যৌবন সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্বশুর গৃহে শাশুড়ী ননদিনীর সহিত কথায় কথায় তাহার বিবাদ বাধিতে লাগিল, তাঁহারা তাহার মঙ্গলের জন্য সৎপরামর্শ দেন, চপল স্বভাবের পরিবর্ত্তন জন্য আকিঞ্চন করেন, সে সকল সুকুমারীর মনোমত হয় না, এইরূপে গণ্ডগোল বাধাইয়া যুবতী একদিন শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল।

তারকচন্দ্র সুকুমারীকে ভর্ত্তৃগৃহে পাঠাইয়া পুনরায় দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই, ভদ্র মহাশয় দ্বিতীয় বার বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সুকুমারীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জানিতেন, বালিকা বয়সে কন্যাকে আদর দিয়া পরিণামে তাহার সমধিক চাঞ্চল্য ও বাচালতা লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে মনে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, মানসিক বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের সূচনা হয়; ভাঙ্গড়ের দেশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে তাহার অস্তিত্বের লোপ পাইয়া যায়, কিছুমাত্র চিহ্নও

থাকে না। পিতার আদরিণী হইয়া বিমাতার সহিত কন্যার আদৌ সদ্ভাব ছিল না, কামময়ী সুকুমারী নিজের ইচ্ছামত কার্য্যসাধনে উদ্যোগী হইয়া, পরিণামে পাপসাগরে নিমগ্না হইবার সূত্রপাত করিল। ভাগ্য দোষে যুবতীর অলৌকিক রূপরাশি তাহার শত্রুতা সাধন করিল। যৌবন চাপল্যে স্বল্পদিনে সুকুমারী বিপথগামিনী হইল। হীন প্রকৃতি যুবক বৃন্দের নিকটে স্বেচ্ছাচারিণী পরম আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল, তাহাতে পাপিয়সী বহুমূল্য মণি মাণিক্য খচিত অলঙ্কারাদির অধিকারিণী থাকায় সহসা অর্থানাটন জন্য কষ্ট পাইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না।

কলিকাতা মহানগরী যাবতীয় দুষ্কৃতির রঙ্গভূমি। ভালমন্দের ইতর বিশেষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, দশজনে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, মান সম্ভ্রম দেয়, অথচ এরূপ লোকের আভ্যন্তরিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুকুমারী বিলাসিনী, আমোদ প্রমোদ একমাত্র জীবনের প্রিয় সামগ্রী বুঝিয়াছে, এরূপ অবস্থায় হীন প্রকৃতি লোকের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া সুকুমারী দুর্ল্লভ সতীত্ব রত্নের অনাদর করিয়াছিল, একে একে তাহারা সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুকুমারী তখনও বিলাস ভোগে পরিতৃপ্তা হয় নাই, কিন্তু যেরূপ হাবভাবে সে দিনাতিপাত করে, তাহাতে সাধারণে তাহার সহিত কেহ কোন প্রকার বাক্যালাপ করিতেও সহসা সাহসী হয় না। সময় ক্রমে জনৈক ধন কুবেরের পৌত্র সুকুমারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইল, ভদ্র মহিলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব ধনে যে দিন বঞ্চিতা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে হিন্দু গৃহের গৌরবের ধন পাতিব্রত্যের মাধুর্য্য ও লাবণ্য হারাইয়াছে, এখন সাজ সজ্জা বেশভূষার পারিপাট্যে সুকুমারী দর্শকবর্গের মনোমোহিনী সাজিয়াছে মাত্র।

যুবক নীরদনারায়ণ ভোগ বিলাসী, যথেষ্ট ধন সম্পত্তি পিতামহ মহাশয় সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, পিতা পিতৃব্য কাহাকেও যে পরিশ্রম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সে ভাবনা চিন্তা নাই। তাঁহারা আহার বিহার আমোদ প্রমোদকেই সুখ বুঝিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় নীরদনারায়ণ অর্থোপার্জ্জনে বা শিক্ষালাভে যত্নবান হইবেন কেন? আমোদ প্রমোদে বিলাস ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া নীরদনারায়ণ সুকুমারীর প্রণয়প্রার্থী হইল, গৃহস্থের কুলবধূ আজ বারাঙ্গনা সাজিয়াছে! লজ্জা ভয় মান সম্ভ্রম একে একে সে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে। নীরদনারায়ণ কুলটার ভ্রূকুটি ভঙ্গি সোহাগের সামগ্রী ভাবিয়া এককালে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সুকুমারী পিতৃগৃহ হইতে প্রস্থান কালে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি সহ একমাত্র দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তান লইয়া আসিয়াছিল, কলঙ্কিনী পুত্রবাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মায়া মমতা ত্যাগ করিতে পারে নাই, পুত্রের রক্ষার জন্য তখনও বিশেষ যত্নবতী ছিল।

যে দিন হইতে সুকুমারীর গৃহে নীরদনারায়ণের গতিবিধি হয়, সেই দিন হইতেই উভয়েই উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ে। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নভাবাপন্ন হইলেও, মোহিনী মায়ায় একে অন্যকে আপনার ভাবিয়া আদর যত্ন করে। সুকুমারী ভদ্রমহিলা, পিতৃ বা শ্বশুর কুল উভয় পক্ষেই যথেষ্ট বংশমর্য্যাদা সম্পন্না, আজ সে স্বেচ্ছাচারিণী বিলাসিনী সাজিয়া সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিপথগামিনী হইয়াছে, বাটীর বাহিরে আসিয়াই গুরুতর অপ-কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া প্রথমে তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল, ধিক্কার দিয়াছিল; কিন্তু সময়ে অসৎ প্রবৃত্তি সতের উপর আধিপত্য বিস্তার করায়, যুবতী পাপের পশরা মস্তকে লইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্ব্বিবাদে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। নীরদনারায়ণ বিলাসের দাস, সুকুমারীর রূপলাবণ্যে আসক্ত হইয়া তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিল। পাপীয়সীর মুখ হইতে

কোন কথা নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই নীরদনারায়ণ শশব্যস্তে তাহার বন্দোবস্ত করে, তাহাতে সুকুমারীর আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠে। দুই এক বৎসর এই ভাবে থাকিতে থাকিতেই, তাহার পুনরায় গর্ভ সঞ্চার হইল ; প্রেমিক প্রেমিকার পূর্ণ প্রণয়ের প্রতিরূপ প্রকাশ পাইল। এই ভাবে নীরদনারায়ণ যথাক্রমে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রত্নের পিতা হইল। সুকুমারী সংসারে ধিক্কার দিয়া বিপথগামিনী হইয়াছিল, কিন্তু পুত্র কন্যা মণ্ডলী পরিবেষ্টিতা হইয়া সে নারকী ঘোর সংসারী সাজিল!

নীরদনারায়ণ দ্বারবান, ব্রাহ্মণ, বেহারা, দাস দাসী সকলের মাসিক বেতনাদি ও সুকুমারীর অন্যান্য যাহা কিছু খরচ পত্র সমস্ত সরবরাহ করে, সে কারণ রমণীকে আদৌ ভাবিতে হয় না, যে কোন প্রকারে হউক নীরদনারায়ণকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারিলেই সুকুমারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। ইতিপূর্ব্বে নীরদনারায়ণ কদাচ কোন বেশ্যার কুহকে পড়ে নাই, এজন্য সুকুমারীর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া যুবক আত্মহারা হইয়াছিল। সুকুমারী তাহাকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন না করিলেও সহজেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিল।

সুকুমারীর পিতা অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে দৌহিত্র মাতামহের সমস্ত বিষয়ের একমাত্র অধিকারী হইবার কথা, কিন্তু গর্ত্তধারিণীর দোষে অভাগা সেই অতুল ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইল। আট নয় বৎসর নীরদনারায়ণের সহবাসে দিন যাপন করিয়াই সুকুমারীর চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু পাপিয়সী যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, সমাজের কঠিন বন্ধন ছেদ করিয়া তাহা হইতে অন্য পথে যাইবার তাহার সাধ্য নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে অবলম্বিত পথ নিদর্শনে চলিতে হইবে। রমণী যতই এবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্তবিকার হইতে লাগিল, কিন্তু এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর

কি করিবে? হিন্দু মহিলার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্নে দুশ্চারিণী জলাঞ্জলি দিয়াছে, এখন সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই, সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। সুকুমারী সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকে; উত্তরোত্তর এইরূপ বিষণ্ণ অবস্থাতেই তাহার দিনাতিপাত হইতে লাগিল।

অবিমিষ্যকারিতা দোষে যৌবন চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া সুকুমারী হিন্দুমহিলার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে, সংসারে তাহার সাধ আহ্লাদ সকলই ফুরাইয়া আসিয়াছে, এখন যে কোন উপায়ে হউক জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটী শেষ করিতে পারিলেই, সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, কিন্তু বিপথ গামী হইবার কালে যাহাদিগকে জীবন-সহচর ভাবিয়া সৌহৃদ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া কৃত্রিম স্নেহ মমতা প্রকাশে কতই ভালবাসা জানাইয়া ছিল, সুকুমারীর এতদিনে সে চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। নীরদনারায়ণের অধীনে থাকিয়া রমণীর গ্রাসাচ্ছাদন বা আরাম বিরামের কোন কষ্ট ছিলনা, কিন্তু অভাগিনী যে অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কলঙ্ক-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার কঠোর দণ্ড হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে? পাপিয়সীর বাহ্যিক কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হইলেও, সে অহর্নিশি সেই অন্তর্জ্জালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কলঙ্কিনীর সে ঘোর যাতনার অব্যাহতি কোথায়? সে মহাপাপে উদ্ধার নাই! সময়-স্রোতে কুলটা রমণীগণের সহিত সুকুমারীর আলাপ পরিচয় হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তাহার ঘৃণা হইত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারাই তাহার আত্মীয় স্বজনরূপে পরিগণিতা হইয়াছে। সমাজে সুকুমারীর প্রতি স্নেহনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে কেহই নাই, রমণী অদৃষ্ট-প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া ভবিষ্যৎ ভালমন্দের প্রতি দৃষ্টিহীনা হইয়া দীনমনে দিন যাপন করিতে লাগিল।

সুকুমারীর আত্মীয় স্বজন এক্ষণে বারাঙ্গনা মণ্ডলী। যাঁহাদের আশ্রয়ে তাহার বাল্যজীবন যাপিত হইয়াছে, যে অবধি সে তাঁহাদের সমাজ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে, আর কেহই তাহার ভাল মন্দের খবর রাখেন না। নীরদনারায়ণ কয়েক বৎসর সুকুমারীর প্রণয়াসক্ত হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছে যে, দিনে দিনে তাহাকে জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইতেছে, অধিকন্তু সে অসৎ কার্য্যে অনুরক্ত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বিলাস বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে যে মান সম্ভ্রমের খর্ব্ব করিতে বসিয়াছে—এধারণা তাহার সম্যক উপলব্ধি হইল। নীরদনারায়ণ যে ভাবে সুকুমারীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, সন্তান সন্ততি বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কয়েক বৎসরেই তাহার সে ভাবের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কুহকিনী সুকুমারী বিপথগামিনী হইয়া যেরূপ হাবভাবে নাগরিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয়, তাহাতে বিলক্ষণ শিক্ষিতা ও দীক্ষিতা হইয়াছে, প্রেমিকের হৃদয় ভাবের যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে রমণীর অজ্ঞাত রহিল না, কিন্তু নীরদনারায়ণের প্রতি তাহার কোন প্রকার আধিপত্য বিকাশের শক্তি কোথায়?

যোগে যাগে যে কয়েক দিন নীরদনারায়ণ তুষ্ট থাকিয়া সুকুমারীর সহিত আলাপ পরিচয় রাখে, এখন অনন্যোপায় হইয়া সুকুমারী তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। প্রণয়াবেগে একে অন্যকে আপনার করিয়া লয়, অসৎ ভিত্তিতে সংস্থাপিত এ প্রেমে কিন্তু একবার চিত্তবিকার হইলে, অবিলম্বে সে বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, বালির বাঁধ কতক্ষণের জন্য? নীরদনারায়ণ চৈতন্য হারাইয়া বারাঙ্গনা-প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছিল, অনুষ্ঠিত কার্য্য যখন গর্হিত বলিয়া তাহার মনে সংস্কার হইয়াছে, সে কালে এ ভালবাসা কতক্ষণের জন্য? কথায় কথায় সুকুমারীর সহিত তাহার

বিবাদ বাধিতে লাগিল। অবিলম্বে নীরদনারায়ণ প্রেমিকাকে এক কালে ত্যাগ করিল, পরস্পরে আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। এক্ষণে বালক বালিকাগণের প্রতিপালনের ও পরিচর্য্যার ভার সমস্তই সে কুলটাকে নির্ব্বাহ করিতে হইল, তাহাদের মুখের প্রতি তাকাইতে ইহ সংসারে আরত কেহ নাই! যুবতী যাহা লইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই প্রথম আলাপ পরিচয়ে প্রবঞ্চকগণ আত্মসাৎ করিয়াছে, তথাচ যৎসামান্য যাহা আছে, সাবধানে রাখিতে পারিলে গ্রাসাচ্ছাদন জন্য তাহাকে বা তাহার পোষ্য বর্গকে অন্যের গলগ্রহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভগ্নহৃদয়ে সুকুমারী এক্ষণে লেখাপড়া শিক্ষায় যত্নবতী হইল, পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ ব্যতীত সংসারে আর সুখ নাই স্থির জানিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ, বরদা ও রমণের সহিত সুকুমারীর বাটীতে উপস্থিত। মোহিনীর নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিন জনেই আসিয়াছে, রমণের সহিত নগেন্দ্রের বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও কথায় বার্ত্তায় আমোদ প্রমোদে রমণ বড় সুরসিক ও মজ্‌লিসি। নগেন্দ্রনাথ মোহিনীর বাটীতে একদিন রমণকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে রমণের ভাব ভঙ্গিতে সে বাটীর সকলেই তাহার প্রতি আদর অনুরাগ দেখাইয়া ছিল, সেই কারণে নগেন্দ্রনাথ সমাদরে রমণকে সঙ্গে আনিয়াছে।

সুকুমারী অভ্যাগতদিগকে বিশেষ খাতির যত্ন করিয়া মোহিনীর গৃহে বসাইল, নগেন্দ্রনাথ মোহিনীকে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাবে পূর্ব্বে তাহার প্রতি চাহিয়াছে, এখন তাহার সে দৃষ্টি নাই।

মোহিনীর গৃহে বসিয়া গৃহাধিকারিণীকে দেখিতে না পাইয়া নগেন্দ্র আপন মনে বলিল, "যাহার ঘর, তাহারই যদি দেখা নাই, তবে আমাদের এখানে বসিবার প্রয়োজন ?" সুকুমারী কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকিলেও নগেন্দ্রনাথের কথা কয়েকটী তাহার কর্ণগোচর হইল, গৃহিণী উত্তর করিল, "মোহিনীর দারুণ লজ্জা! বরং বরদা বাবু আসিলে সে কথাবার্ত্তা কয়, কাছে আসে, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া সে এ ত্রিসীমা হইতে সরিয়া গিয়াছে।"

ন। যদি কেহ আমার জন্য গৃহত্যাগ করে, তবেত আমার এখানে বসা ভাল হয় নাই।

সু। সে আপনিই জানেন, আমি আর কি উত্তর দিব ? তবে যতক্ষণ আমি আছি, ঘর বাড়ী সমস্তই আমার, আমি আপনাকে আকিঞ্চন করিয়া আনিয়াছি, আপনি এ ঘরে বসিতে দূষ্য ভাবিতেছেন কেন ?

ন। না তা নয়, তবে কিনা, একজনের ঘর আমরা অধিকার করিয়া রহিলাম, সে আমাদের জন্য ঘরে আসিতে পারিতেছে না, অবশ্যই এটা তাহার পক্ষে কষ্টের বিষয়, আর আমাদেরও অন্যায় কার্য্য।

সু। মোহিনীর সবই যেন কেমন ধারা, আমার বড়মেয়ের মত নহে।

র। নগেন্দ্র বাবু! ব্যস্ত হচ্চেন কেন ? আজ মোহিনী বিবি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি যদি স্বয়ং বসিয়া আমাদের না খাওয়ান, আমরাইবা খাইব কেন ?

ব। তোমাদের বেশ কথা কাটাকাটি চলিতেছে, আমি কেন জড়সড় হয়ে বসিয়া থাকি ? তোমাদের এ সব নূতন বটে, আমার কাছে আর কাহারও লজ্জা সরম নাই! তোমরা ঘরে থাক, আমি বাহিরে বসি, দেখি খাবার দাবার উদ্যোগ হইল কি না!

সু। বরদা বাবু কি পেট হাতে করিয়া আসিয়াছেন ?

ব। যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তখন না আসিব কেন? এতক্ষণ বসিয়া রহিলাম, এখনও এক ছিলিম তামাক পাইলাম না, নিমন্ত্রণের খাতিরটা দেখছি খুব!

সু। আজ ত তোমার খাতির নয়, নগেন্দ্র বাবুর নিমন্ত্রণ! আমার নগেন্দ্র বাবুর ওসব হাঙ্গাম কিছুই নাই।

ব। ভাল, নগেন্দ্রকে লইয়াই থাক, আমি ওঘরে যাইতেছি।

ইতি মধ্যে একজন পরিচারিকা তামাকু লইয়া গৃহে আসিল। বরদা তাহার হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। এমন সময়ে রমণ মোহিনীকে তথায় আসিবার জন্য সুকুমারীর নিকট বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

এদিকে অন্তরাল হইতে একে একে তিন খানি কাঞ্চননগরীর থালা গৃহদ্বারে সংস্থাপিত করা হইল, গৃহ হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা গেল যে, মোহিনী স্বয়ং দ্বার দেশে আসিয়া থালা গুলি স্তরে স্তরে রাখিয়া গেল। গৃহস্থিত সকলেই একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া দেখিলে, সুকুমারী মোহিনীর উদ্দেশে বলিল, "মোহি! তুই আসিয়া থালা গুলি সাজাইয়া না দিলে, ইহাঁরা কেহই আহার করিবেন না, এত কষ্ট করিয়া তুই যে মাংস প্রস্তুত করিলি, যদি ইহাঁরা কেহ না খান, তাহা হইলে তুই মনে কষ্ট পাবি।"

অন্তরাল হইতে মোহিনী উত্তর করিল, "আমিত সকল সাজাইয়া দিয়াছি, এখন উহাঁরা আহার করুন না কেন, আমি এখান হইতে দেখিতেছি।"

র। তাও কি কখন হয়, তুমি আমাদের নিকটে বসিয়া না খাওয়াইলে—আমরা খাইব কেন!

ন। রমণ বাবু! যখন উঁর এ ঘরে আসিতে লজ্জা বোধ হচ্ছে, তখন এ বিষয়ে আমাদের উপরোধ অনুরোধের প্রয়োজন নাই, এস আমরা

আহার করি। মাংসের সৌরভেত মন আকুল করিতেছে, খাইতে কেমন হইয়াছে বলা যায় না!

র। সম্মুখেই রহিয়াছে, একখানা লইয়া মুখে ফেলিয়া দিন, তাহা হইলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

সু। মোহিনী আজ নূতন রকমের মাংস রাঁধিয়াছে, আমরা অতশত জানি না, সে মোগলাই কারি রাঁধিয়াছে।

ন। দেখিতেও বড় সুন্দর দেখাইতেছে।

র। না দেখাইবে কেন? কেমন লোকের হাতে তৈয়ার।

মোহিনী অন্তরালে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া সম্মুখে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল, "এই বেলা না খাইলে মাংসের স্বাদের তফাৎ হইবে।"

ব। আমি তোমার মার হাতের রান্না খাইয়াছি, তোমার হাতে কখন খাই নাই। আজ তোমায় পরীক্ষা করিব।

বরদার কথায় মোহিনী উত্তর করিল, "আমি পরীক্ষার জন্যই এখানে বসিয়া আছি, ভাল মন্দ আপনারা খাইলেই বুঝিতে পারিব।"

ন। বরদা বাবু! যদি মোহিনীর রান্না ভাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে একদিন খাওয়াইতে হইবে, মোহিনী যে এতকষ্ট করিয়া রশুই করিল, তাহারত কিছু পুরস্কার চাই!

সু। নগেন্দ্র বাবু! আপনি এ বিষয়ে কথা উত্থাপনের পূর্ব্বেই মোহিনী আমাকে বলিয়া রাখিয়াছে যে, যদি আজ রশুই ভাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ও যামিনীকে লইয়া এক দিন থিয়েটার দেখাইয়া আনিতে হইবে।

ন। ভাল, সে কথায় সম্মত আছি, আপনারা ইচ্ছা করিলে—আজই লইয়া যাইতে পারি।

সু। আজ শনিবার বটে, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, বোধ হয় এতক্ষণে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর এখনও ওদের খাওয়া দাওয়া হয় নাই, সে এক দিন আগে ঠিক করিয়া লইয়া যাইবেন।

বন্ধুত্রয় আমোদ প্রমোদের সহিত আহার করিতে বসিল। সুকুমারী সাক্ষাতে থাকিয়া তাহাদের আহারের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। মাংসের আঘ্রাণে তিন জনের প্রাণই মোহিত হইয়াছিল, কথায় বার্ত্তায় কথঞ্চিৎ জুড়াইলেও মাংস খাইতে বিশেষ সুস্বাদু হইয়াছিল, এজন্য সকলেই এক বাক্যে মোহিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল। মোহিনী অন্তরাল হইতে তাহার মাংস রন্ধনের সুখ্যাতির কথা শুনিয়া সোৎসাহে নগেন্দ্র বাবুকে আর একদিন আহার করিবার জন্য আকিঞ্চন করিল। মোহিনীর কথায় রমণ উত্তর করিল, "এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হইবে? আমি আর বরদা বাবু কি অপরাধ করিলাম যে, নিমন্ত্রণে আপনি বঞ্চিত করিতেছেন?"

রমণের কথায় মোহিনী অন্তরাল হইতে দ্বারদেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথ মোহিনীর অপরূপ রূপসাগরে ক্ষণমধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেলেন, এক দৃষ্টে এক মনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টিতে নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যেন কি এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত ভাবের উদয় হইল, কিন্তু কথায় কিছুমাত্র প্রকাশ হইল না। মোহিনী রমণকে নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করিল, "আজ যাঁহারা আহার করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেছি।"

র। ভাল, যে দিন খাওয়াইবেন, তাহার পূর্ব্ব দিনে যেন সংবাদ পাই, নতুবা আমার সুবিধা না হইতে পারে।

ব। রমণ বাবু! আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, অনেকের মন যোগাইয়া আপনাকে চলিতে হয়, বরদা বাবু যদিও এক সময়ে আপনার

মত অনেকের সহিত আলাপ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখন কাহারও অমর্য্যাদা করেন নাই, তাঁহার উপস্থিত হাব ভাবেই সে স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে বরদা বাবুর আলাপ হওয়াবধি আমিতো এক দিনের জন্য তাঁহাকে কখন কোন বিষয়ে কাহাকে বঞ্চিত করিতে দেখি নাই।

র। তা নয়, তা নয়, তবে কিনা শনিবার না হইলেত আর আপনাদের এরূপ আহারাদির উদ্যোগ হইবে না। আমি শনিবার হয়ত স্থানান্তরে যাইতে পারি। অগ্রে সংবাদ পাইলে, এখানে আসিতে অন্যথা হইবে না।

ন। আপনার অনেক কাজ, অনেকের সহিত আলাপ পরিচয়, আমার এই দুঃখ যে পৃথিবীতে আমাকেত কেহ এরূপ আমন্ত্রণ করে না, অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় আছে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের সহিত মৌখিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীতে এক জন ছিল, যে আমাকে আমার বলিয়া আদর যত্ন করিত, খোঁজ খবর লইত, আপনার জানিয়া হৃদয়ে ঠাঁই দিত, কিন্তু কপাল গুণে সে আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অভাবে আমার যে কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমি এখনও নিজেই বুঝিতে পারি নাই।

মো। মহাশয়! আপনার কথা ছাড়িয়া দিন, আপনিতো আর ইহাঁদের মত লোক নহেন, আপনার স্বভাব চরিত্র ভিন্ন ধরণের; তাই আপনি এখনও স্ত্রীর ভালবাসা ভুলিতে পারেন নাই। আমরাও মা'র মুখে আপনাদের বড় বৌয়ের বিস্তর প্রশংসা শুনিয়াছি। তিনি ভাগ্যবতী, পতি-পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন—স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার সহিত কি আর অন্যের তুলনা চলে? আপনি তাঁহার কথা তুলিয়া মন খারাপ করিবেন না, কি করিবেন? সকলই ঈশ্বরের হাত। তিনি যাহার অদৃষ্টে যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি আমি তাহার কি অন্যথা করিতে পারি?

মোহিনীর কথায় নগেন্দ্রনাথের নয়নযুগল অশ্রুধারায় পূর্ণ হইল; তিনি রোদন সংবরণ করিতে না পারিয়া নীরবে সঙ্গোপনে উত্তরীয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মুছিলেন। অন্যের অলক্ষ্য হইলেও নগেন্দ্রনাথের প্রতি মোহিনীর সম্যক দৃষ্টি ছিল। মোহিনী, নগেন্দ্রনাথকে কাঁদিতে দেখিয়া, সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া থিয়েটারের কথা পাড়িল।

এইরূপ কথায় বার্ত্তার গল্পে স্বল্পে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। রাত্রিও অধিক হইয়াছে জানিয়া নগেন্দ্র, বরদাকে বাটী যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। রমণের ইচ্ছা, আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া মোহিনীর সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু অন্য দুই জনের তাহা অভিপ্রেত না হওয়ায়, অগত্যা বিদায় গ্রহণের উদ্যোগী হইল। রমণ, এতক্ষণ কাটাইল বটে, কিন্তু গান-বাজনা না হইলে তাহার মনে স্ফূর্ত্তি হয় না; সে একাই আসর মাৎ করিয়া তুলে, একে বরদা বা নগেন্দ্রনাথের সহিত তাহার নূতন পরিচয়, তাহাতে যে মোহিনীর বাটীতে আসিয়াছে, তাহার সহিতও তাহার এই নূতন আলাপ হইয়াছে, আবার ভদ্রপল্লীর জন্য সুকুমারীর বাটীতে গান, বাজনারও সুবিধা নাই, এই সকল ভাল মন্দ ভূত ভবিষ্যৎ আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে, রমণ, বিদায়ের উদ্যোগী হইল। নগেন্দ্রনাথ, বরদা ও রমণকে সঙ্গে লইয়া মোহিনার গৃহ হইতে বারাণ্ডায়, বারণ্ডা হইতে সিঁড়িতে, স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া—থম্‌কাইয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রথম রাত্রিতে সুকুমারী, প্রদীপ লইয়া তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। আজ মোহিনী মাতার কার্য্য করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ যে দিন সুকুমারীর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে মোহিনীর সহিত সুকুমারীর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মোহিনী, দর্শকমাত্রেরই হৃদয় আকৃষ্ট করে, তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য, মনোহর হাব-ভাবে একবার যে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করে,—সে, আর তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথের সহিত মোহিনীর এখনও কোন কথাবার্ত্তা না হইলেও, উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রথম সাক্ষাতেই আকৃষ্ট হইয়াছে। সুকুমারী বহুকালাবধি বেশ্যাবৃত্তি-অবলম্বনে দিনপাত করিয়াছে বলিয়া, কাহার কিরূপ প্রকৃতি, বাহ্য আকার ও আলাপ পরিচয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। মা ও মেয়ে, আহারান্তে এক দিবস কথোপকথনচ্ছলে নগেন্দ্রনাথের বিষয়ে আন্দোলন করিল, সুকুমারী বলিল,—"নগেন্দ্র বাবু বেশ ভদ্রলোক, লোকের মানমর্য্যাদা বুঝেন, তাঁহার স্বভাবচরিত্র অতি সুন্দর, তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, জনসমাজে তাঁহার বেশ খ্যাতিপ্রতিপত্তিও আছে।"

মো। আচ্ছা মা! তুমি নগেন্দ্র বাবুর এত প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি মনে মনে তাঁহার চরিত্র যত দূর উন্নত অনুমান করিতেছ, তাহা সেরূপ নহে। ভাল, যখন বরদা বাবুর সহিত তিনি আমাদের বাটীতে একবার আসিয়াছেন, অবশ্যই সময়ে দেখা-সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার সকল কথাই প্রকাশ পাইবে। এখন আমি তোমাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

সু। তুই সকলকেই নিজের মত দেখিয়া থাকিস্! নগেন্দ্র বাবুর স্বভাবচরিত্র লোকের আদর্শ-স্বরূপ। তাঁহার সহিত কথা কহিলে প্রাণ জুড়ায়, পাড়ায় এত লোক আছে, সকলেরই কোন না কোন দোষের

কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর কথা লইয়া কখন কোথায়ও আন্দোলন হইতে শুনি নাই, সকলেরই মুখে তাঁহার সুখ্যাতির কথাই শুনিতে পাই; তোর এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। তবে, নগেন্দ্র বাবু ছেলে-বেলা হইতেই আমোদপ্রমোদ ভালবাসেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্কের রেখা প্রকাশ পায় নাই।

মো। মা! আমি তো বলিয়াছি—কার্য্যে নগেন্দ্র বাবুর স্বভাবের পরিচয় দিব। যখন তিনি বরদা বাবুর সহিত মিশিয়াছেন, শিবতুল্য প্রকৃতির লোক হইলেও যে, স্বল্প দিনে তাঁহার অধোগতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

সু। দেখ, নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইতেই তাঁহার মনটা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, এখনও তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। আমার সহিত যখন দেখা হয়, কথায় কথায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর কথা তুলিয়া নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। আমি তাঁহাকে কত বার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছি। আহা! ভদ্রসন্তান কি মনস্তাপানলেই দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে!

মো। মা! তুমি নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইলে সকলেই তোমাকে আদর যত্ন করে?

সু। না করিবে কেন? আমাকে তাঁহারা আত্মীয়ের মত ভালবাসেন। আমার যখন যে কোন প্রয়োজন হয়, সর্ব্বাগ্রে নগেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হই। নগেন্দ্র বাবুর মাতা-ঠাকুরাণী, ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ সকলেই আমাকে বিশেষ ভালবাসেন, আমিতো কোন অনাদর দেখিতে পাই না।

মো। দেখ মা! তুমি বলিয়াছ, নগেন্দ্র বাবু নির্ম্মল-চরিত্রের লোক, আমি তাঁহাকে তোমার সমক্ষে অন্য প্রকৃতিতে দেখাইব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। দেখি—ঈশ্বর কাহার মুখ রক্ষা করেন। কিন্তু মা, যদি তোমার পরাজয় হয়, তাহা হইলে আমাকে একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে;

আর যদি জয় হয়, তুমি আমার নিকট যাহা খাইতে চাহিবে, আমি তাহাই খাওয়াইব।

সু। তুই যে কি সাহসে আমার সহিত বাজি রাখিতেছিস্, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

মো। আমার ভরসা একমাত্র বরদা বাবু। নগেন্দ্র বাবুর সহিত আমার আলাপপরিচয় কিছুই নাই, তিনি আমায় দেখিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি মাত্র। দেখা যাক—এই দেখা-সাক্ষাতেই কত দূর গড়ায়!

সু। না না, যে ব্যক্তির চরিত্র কলুষিত হয় নাই, তাহার স্বভাব নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ, নগেন্দ্র বাবুকে আমি বিশেষ সন্মান করি, আমার ইচ্ছা—চিরদিন যেন নগেন্দ্রকে সেই ভাবেই দেখিতে পাই।

মো। তা নয় মা! তোমার ধারণা যে, নগেন্দ্র বাবুর স্বভাবে কলঙ্কের লেশমাত্র নাই, তাই তোমাকে এক দিনের জন্যও তাঁহার বিকৃত মূর্ত্তি দেখাইব, আমার এ সাধে তুমি বাদ সাধিও না।

সু। নগেন্দ্র বাবু যদি আমাদের বাটীতে আর না আসেন, তাহা হইলে তোর সকল জারি-জুরি ঘুচিয়া যাইবে। মিছে তোর সাপট্ আমায় ভাল লাগে না।

মো। দেখ মা, সে দিন রমণ ও বরদা বাবুর সহিত তিনি এখানে আসিয়া দুই তিন টাকা খরচ করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে খাইবার জন্য একান্ত আকিঞ্চন করিলে, তিনি যৎসামান্যমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার ইচ্ছা—তাঁহাকে আর একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইব।

সু। নগেন্দ্র বাবু, নিজ মুখে এক দিন আমাদিগকে খাওয়াইতে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে খাবার কথা বলিলে তিনি হয়তো টাকা দিয়া বসিবেন! তাই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আমার লজ্জা হয়।

মো। ভদ্রলোক পয়সা খরচ না করিয়া আমাদের বাড়ীতে আহার

করিবেন কেন? তুমি তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণক রিয়া আইস, তার পর তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার কাছে। যদি টাকা দেন—ভালই; না দেন—না হয়, আমাদেরই কিছু খরচ হইবে।

মা ও মেয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তায় বহু ক্ষণ কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে, সূর্য্যদেব, পশ্চিম গগনে লীন হইলেন। ধরাতল, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিল। সুকুমারী সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইল, মোহিনী আপনার বেশভূষায় সাজিল; কিন্তু সাধারণতঃ, গণিকাগণ, যেরূপ হাব-ভাবে নাগরগণের চিত্ত-বিনোদনে উদ্যোগিনী হইয়া থাকে,—যুবতী, সমবৃত্তি অবলম্বন করিলেও, তাহার সে ভাবের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ছিল।

সুকুমারী, পুত্রকন্যা লইয়া সংসারী হইয়াছে, স্বেচ্ছায় সতীত্ব-রত্নের অনাদরে অসদ্-বৃত্তি অবলম্বনে সে, আপনার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, উত্তরোত্তর যতই বয়স বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু যে অকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাতে ইহজন্মে যে, সে—কূল পাইবে—সে আশা-ভরসা তাহার আর নাই, স্রোতের মুখে তৃণের মত সপরিবার ভাসিয়া চলিয়াছে, তীর্থপর্য্যটন দেবসেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে তাহার এখন মন ফিরিয়াছে, কিন্তু পায়ের বেড়ি—অপগণ্ড-গুলিকে নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছে না, মায়ায় মোহবন্ধনে জড়িত হইয়া তাহাদের মুখের প্রতি তাকাইয়া সংসার-আশ্রমে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

সমাজের সহিত সংস্রব রাখিয়া দিন-যাপনের সুবিধা নাই বুঝিয়া সুকুমারী, ভদ্রপল্লীতে একখানি বাটী খরিদ করিয়াছে, মনে মনে স্থির ভাবিয়াছে যে, যদিও ভদ্রলোকের সহানুভূতি লাভ, ইহ জন্মে ঘটিবে না, তথাচ ইতর-সংস্রবে অধিকতর অধোগতি না হইয়া দুঃখে কষ্টে কোন না কোন প্রকারে দিন কাটিয়া যাইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী লেখাপড়ায়

উপায়ক্ষম না হইলেও, কায়িক শ্রমে সময়ে সময়ে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুকুমারীর কথঞ্চিৎ সাহায্য করে, কিন্তু সে আয়ের কিছুই স্থিরতা নাই। অন্যান্য বালকগুলি তখনও বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা ভবিতব্যের গর্ব্ভে লুপ্ত রহিয়াছে। কন্যা দুইটীর যথা-সময়ে আসুরিক প্রথানুসারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের দেহ বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থে জীবন-যাপন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুকুমারী এক্ষণে যে পল্লীতে বাস করিতেছে, তথায় গণিকাশ্রম আদৌ নাই, কিন্তু কন্যা দুইটী কুলটা বৃত্তি অবলম্বন ব্যতিরেকে কেমনে জীবন ধারণ করিতে পারে? সুচতুরা সুকুমারী ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুইটী ভদ্র-সন্তান প্রতি রাত্রিতে সুকুমারীর বাটীতে আসিয়া আমোদপ্রমোদে কাল-ক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহারা কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের সেবক না হওয়ায় পল্লীস্থ প্রতিবেশীগণের কোন প্রকার সন্দেহ বা বিরক্তির কারণ হয় না। সুকুমারীর কন্যা দুইটীই রূপবতী,—দর্শকমাত্রেরই হৃদয় মোহিত করে, উভয়েই প্রিয়ভাষিণী ও চিত্তবিনোদিনী। জ্যেষ্ঠা যামিনী, উপেন্দ্রের প্রণয়ে মুগ্ধ, সে উপেন্দ্রকে স্বামীর মত দেখে—ভালবাসে, আদর যত্ন করে। উপেন্দ্রের বাঁধা-ধরা কোন কাজ কর্ম্ম না থাকিলেও ব্যবসায়-সূত্রে তাহার দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ জন্য তাহাকে বিশেষ ভাবিতে চিন্তিতে হয় না, একমাত্র যামিনীকে লইয়াই তাহার সংসারের সকল সাধ আহ্লাদ মিটিয়া থাকে। কনিষ্ঠা মোহিনী, সুরেন্দ্রের উপপত্নী, সুরেন্দ্রের আপনার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, আত্মীয় সম্পর্কে এক পিসী মাতা ঠাকুরাণীকে লইয়া সে, সংসারী। উপেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের বাল্যকালের আলাপ পরিচয়, তাহাতে উভয়ে একত্র কারবার,—এক স্থানে আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে, উভয়েরই একত্র গতিবিধি। এ কারণ পরস্পর, বিশেষ সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ। যামিনী অপেক্ষা মোহিনী, অতিশয়

চতুরা। উপেন্দ্র প্রকৃত পক্ষে যামিনীর নিকট যেরূপ আদর যত্ন পায়, তাহাতে পরস্পরের ভিন্ন ভাব প্রায়ই লক্ষিত হয় না, সহসা অনুমান হয় যে, উভয়ে দাম্পত্য-প্রণয়ে আবদ্ধ। মোহিনীও, সুরেন্দ্রের আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি করে না। সে, সুরেন্দ্রকে ভালবাসে; কিন্তু জ্যেষ্ঠার মত সকল বিষয়ে সমান ভাব দেখাইতে পারে না।

সুকুমারীর বাটীতে নগেন্দ্রনাথের আগমন হইতেই তাঁহার স্বভাব চরিত্র লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়াছে। নগেন্দ্রনাথকে সুকুমারী প্রকৃতই ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। নগেন্দ্র যখন তাহার বাটীতে আসিয়াছে, বহু দিবস সাধ্য-সাধনায় যে নগেন্দ্র, সুকুমারীর বাটীতে কদাচ পদার্পণ করে নাই, সেই নগেন্দ্র, বিনা আহ্বানে আসিয়াছে, পরিণামে ইহাতে যে, কিরূপ ভাবগতি দাঁড়াইবে, সুচতুরা সুকুমারী, সময়ে সময়ে সেই চিন্তা মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে মোহিনী, সুরেন্দ্রের নিকট হইতে মাসিক বেতন-হিসাবে যাহা পায়, তাহাতে তাহার সকল অভাব মোচন হয় না, সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। যুবতীর যেরূপ রূপলাবণ্য, তাহাতে অনায়াসেই দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া দশের মধ্যে সে, একজন হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু সুকুমারী, এক্ষণে তাহাকে যে পল্লীতে রাখিয়াছে, তাহাতে সে ভাবে উপায়ের বিশেষ সুবিধা হয় না। এদিকে নগেন্দ্রনাথের স্বভাব চরিত্র নির্ম্মল বলিয়া সুকুমারীর স্থির বিশ্বাস। তবে যুবক, নগেন্দ্রনাথ পত্নী-বিয়োগাবধি সদাই যেন অন্যমনস্ক ভাবে থাকে, এরূপ অবস্থায় তাহার স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। যদি কোন গতিকে সে নগেন্দ্রনাথকে মোহিনীর প্রণয়াসক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে এক পক্ষে সুরেন্দ্র, অন্য পক্ষে নগেন্দ্রকে লইয়া কতক অভাব মোচন হইতে পারে। নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে দুশ্চারিণী সুকুমারীর হৃদয়েও একবার বাধা

ঠেকিল, কিন্তু স্বার্থপর হৃদয়ে রমণী, সে ভাব কিরূপে রক্ষা করিতে পারে? পরক্ষণে যে কোন প্রকারেই হউক, মোহিনীর জননী, নগেন্দ্রকে মোহিনীর মোহন-জালে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগিনী হইল, অথচ মনোগত অভিপ্রায় সুস্পষ্ট রূপে কন্যার নিকটও ব্যক্ত করিল না। সুকুমারী একাগ্র চিত্তে পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। নগেন্দ্র, সম্পূর্ণরূপে স্বোপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সুকুমারীর তাহা কিছুমাত্র অবিদিত ছিল না।

প্রকৃতির অভাবে পুরুষের হৃদয়গতি ছিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হয়। ঈশ্বরের প্রেমময় রাজ্যে পুরুষ-প্রকৃতির বিহারই একমাত্র শোভা। সাধের সংসার পাতিয়া দাম্পত্যপ্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া স্বামী ও স্ত্রী, পারিবারিক বাদ-বিসংবাদে দৈনন্দিন অভাব সত্ত্বেও মনের আনন্দে কালযাপন করে। প্রকৃত সংসারী ব্যতীত, এ রসের রাসাস্বাদন, অন্যের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। পুরুষ, সারা দিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্যান্তে গৃহে আসিয়া পুত্র-কলত্রাদির মুখ দেখিয়া, যে শান্তি লাভ করে, যে আমোদ পায়, অন্যবিধ উপায়ে সে সুখ—সম্ভোগ হয় না।

এক সময়ে নগেন্দ্রনাথের বিশ্রাম করিবার আদৌ অবকাশ ছিল না, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকিয়া দিবারাত্রি শ্রম করিয়া তাহার দিন কাটিত; কিন্তু এরূপ গুরুতর শ্রমান্তেও যে স্বল্প সময় শান্তির কারণ অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতেই তাহার সকল সুখ সম্ভোগ হইত। মানুষ উপার্জ্জনের জন্য এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা তাহাকে ক্ষুধার জন্য অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সকলই সংগ্রহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, শ্রম দ্বারা সাংসারিক অভাব মোচন করিতে সমর্থ, এ পৃথিবীতে সেই-ই ভাগ্যবান্, নগেন্দ্রনাথ গণ্য-মান্য-পদ-বিশিষ্ট কর্ম্মচারী না হইলেও, নানা কৌশলে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে পরিবার-

বর্গের ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিত; জগতারাধ্য পিতামাতার বর্ত্তমানে সংসারে কতক সাহায্য করিতেছে জানিয়া, সে, মনে মনে আনন্দ লাভ করিত; কিন্তু প্রণয়িনীর বিচ্ছেদাবধি তাহার শরীর ও মন যেন এক-কালে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ, উৎসাহ, অনুরাগ সকলই লোপ পাইয়াছে। এখন যৎসামান্য চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার দিনপাত হয়। পূর্ব্বে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশলে কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দশ টাকা গৃহে আনিত, সে সকল উপায় চিন্তা এখন আর তাহার হৃদয়ে স্থানও পায় না। দিন দিন অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। হতভাগ্য আপনার বিষয়, সময়ান্তরে আপনিই ভাবিয়া দেখে; কিন্তু কি উপায়ে ইহার প্রতীকার হইবে, তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারে না। এক এক সময়ে সংসারের ভাব-গতি দেখিয়া এমনই অবসন্ন ও হতা-শ্বাস হইয়া পড়ে যে, ভাল-মন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না, উৎসাহে কুলায় না।

এক দিকে অপগোণ্ড শিশুগুলি, অন্য পক্ষে পিতার বিশাল সংসার! এ সময়ে এককালে অকর্ম্মণ্য ভাবে কালাতিপাত করিলে, উত্তরোত্তর যে ভীষণ অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহাকে দারুণ কর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে, হতভাগ্য এমনই বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, এক সময়ে তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পর ক্ষণে তাহার আর সে সকল কিছুই মনে থাকে না। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল সাধে সে, জলাঞ্জলি দিয়াছে, উদ্যমবিহীন হইয়া ভগ্নমনোরথে দিনযাপনই এখন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে।

চিত্তবিকারের লাঘবের জন্য নগেন্দ্রনাথ, বরদাকে আপনার ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, বন্ধুর স্বভাবচরিত্রে পার্থক্য থাকিলেও নগেন্দ্রনাথ এখন এমন ভাবে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ তাহার লক্ষ্য হয় না, বরদার সহিত সাম্য-সংস্থাপনে মোহিনীর সহিত

তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, মোহিনীর বাটীতে আহার করিয়া মোহিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি, নগেন্দ্রনাথের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছে।

রমণ ও বরদার সহিত মোহিনীর বাটী হইতে বিদায় লইয়া নগেন্দ্রনাথ বাটীতে ফিরিয়া আসিলে, সঙ্গীদ্বয়, নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইতেই নগেন্দ্রের আর তেমন সুনিদ্রা হয় না, রাত্রির অধিকাংশ সময় নগেন্দ্রের ভাবনা-চিন্তায় কাটিয়া যায়, কি সে ভাবিতে থাকে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, অথচ তাহার ঘুম হয় না। যে দিবস গৃহলক্ষ্মী তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছে, সেই দিন হইতেই নগেন্দ্রনাথ গাঢ় নিদ্রার বিমল শান্তি লাভে একান্ত বঞ্চিত। বহু দিন হইতেই চিত্তের শান্তির জন্য তাহার চেষ্টা; কিন্তু উত্তরোত্তর তাহার হৃদয়ে অশান্তিরই বৃদ্ধি হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ মুখ হাত ধুইয়া শয্যায় শয়ন করিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ সময়ে নিদ্রিত না হইলে, প্রাতরুত্থানের ব্যাঘাত হইবে, তাহাতে সন্ধ্যাকাল হইতে বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়াছে, এ সময়ে বিশ্রামের প্রয়োজন। নগেন্দ্র সুনিদ্রার কামনা করিয়া শয্যাশায়ী হইল, কিন্তু মোহিনীর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে দেখা দিল। ইতঃপূর্ব্বে কতবার মোহিনী নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ যে ভাব, নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছে, সে ভাবে নগেন্দ্র কখনও মোহিনীর প্রতি চাহে নাই। নগেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিল, "কেন এমন হইল!" কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বিষয়ান্তরে মন সংযোগ করিয়া মোহিনীর কথা চিত্ত হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা পাইলেও, নগেন্দ্রনাথ, মোহিনীর দিব্য কান্তি নয়ন-পথে দেদীপ্যমান দেখিল।

নগেন্দ্র মনে মনে ভাবিল, ভাল আজ মোহিনীকে দেখিয়া আমার মন

এরূপ হইল কেন? সংসার, যেন শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে, মোহিনী কি আমায় কোন কুহক-জালে আবদ্ধ করিল! না, সে আমার মনের ভ্রান্তি! কৈ মোহিনী তো আমাকে সেরূপ কোন কথাই বলে নাই, তবে আজ আমার চিত্ত এরূপ হইল কেন? মোহিনী কি আমায় সদয় ভাবে চাহিয়াছে? না, তাও কি সম্ভব? মোহিনী আমার কে? আমি তো তাহার সহিত কখনও কোন প্রকার আলাপ পরিচয় করি না! তাহার মাতা আমাদের বাটীতে সময়ে সময়ে আসে যায় বটে, কন্যা অপেক্ষা মাতা আমার স্বভাব চরিত্র কতকটা জানিতে পারে! তবে, মোহিনী এ কি প্রেম-ফাঁদ পাতিয়াছে যে, আমি তাহাকে দেখিয়া তাহার মনোরম মূর্ত্তি আর ভুলিতে পারিতেছি না! তাহার বিষয় যতই বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছি, ততই যেন সে আমার সমক্ষে আসিতেছে। কেন এমন হইল? স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে আমি তো এরূপ দৃশ্য, এক দিনের জন্যও দেখিতে পাই নাই, তবে কেন মোহিনী আমায় এরূপ মোহিত করিল! এইরূপ চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া অনিদ্রায় নগেন্দ্রনাথের অনেক সময় কাটিয়া গেল। নগেন্দ্র ভাবিল, সারা রাত্রি এই ভাবেই যাইবে, নিদ্রা দেবীর আরাধনা জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেও কিছুতেই তাহার চক্ষু দুইটী নিমীলিত হইল না। কিন্তু তাহাকে আর অধিকক্ষণ এ কষ্ট ভোগ করিতে হইল না, সারা রাত্রির পরিশ্রমে নগেন্দ্রনাথের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সুযোগ-ক্রমে নিদ্রা-দেবী তাহার অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য সকল ভাবনা চিন্তা দূর করিলেন। রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত হইয়া নগেন্দ্র নিদ্রিত হইয়াছে; যথাসময়ে তাহার আর নিদ্রাভঙ্গ হইল না, অন্য দিন অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব হইল।

নগেন্দ্রনাথ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যহ নিত্যক্রিয়া করে, কিন্তু একে উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গেই মোহিনী-মূর্ত্তি

পুনরায় তাহার হৃদয়ে দেখা দিল। নগেন্দ্র ভাবিল, এ কি! মোহিনী কি আমার সঙ্গিনী হইয়াছে? আমি আবার সেই মূর্ত্তি কেন নয়ন-পথে স্পষ্টই দেখিতেছি! ছি ছি! আমার প্রকৃতির কি ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমি মনে মনে স্থির করিতেছি যে, মোহিনীর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে আর ঠাঁই দিব না। কিন্তু এ কি ভাব দেখিতেছি? আবার কেন সেইরূপ দেখিতে পাই? আমার চিত্তশক্তি কি এতই হীন হইয়া পড়িয়াছে? আমি সাধ্য-সাধ্যনায় কিছুতেই মোহিনীর কথা ভুলিতে পারিতেছি না! এ কি মায়ার খেলা! আমি সাধ্বীসতী পতিপ্রাণা প্রেয়সীকে জন্মের মত বিদায় দিয়াছি, এ জীবনে যে তাহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে, সে সম্ভাবনাই আর নাই। তাহার কথা আজ হৃদয়ে ঠাঁই পাইতেছে না, অথচ বারবনিতা মোহিনী আসিয়া আমার হৃদয়ের শূন্য সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়া বসিতেছে, এ ভ্রম কি দূর হইবার নহে? নগেন্দ্র এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে তাহার আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল, তাহাতে অভাগা আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না।

এক দিকে মোহিনীর চিন্তা, অন্য পক্ষে সংসার-ধর্ম্ম। নগেন্দ্রনাথ এ উভয়ের সন্ধিস্থলে পড়িয়া মনের ভাব মনে রাখিয়া গৃহধর্ম্মে মনোযোগী হইল। অন্য দিন প্রাতঃক্রিয়াদি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, চিত্ত স্থির না থাকায়, ঠিক্ সে ভাবে সকল কার্য্য হইয়া উঠিল না। নগেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে একবার লক্ষ্য রাখিয়াছিল, কিন্তু যে ঘোর অশান্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে ভালমন্দের বিচার-শক্তি খাটে না! নগেন্দ্র-নাথের চিত্ত-শান্তির জন্য তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ সময় নগেন্দ্র, বাটীর বাহিরে থাকিলেও, কেহ কোন কথা কহেন না, গৃহমধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলে, তাঁহারা নগেন্দ্রনাথের অমঙ্গল ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধারণা—নগেন্দ্র, পত্নীবিয়োগেই এরূপ ম্রিয়মাণ ও

ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছে। লোকের সহিত কথা-বার্ত্তায় গল্পাদিতে নিযুক্ত থাকিলে, সময়ে নগেন্দ্রের এ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে; এই ভাবিয়াই তাহাকে কার্য্যাবসানে নির্জ্জনে বসিতে দেখিলেই, বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে উপরোধ অনুরোধ করেন। এক্ষণে নগেন্দ্রনাথকে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া বাটীর বাহিরে যাইতে দেখিয়া তাঁহারা মনে মনে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, এককালে নিশ্চিন্ত ভাবে একাকী বসিয়া থাকিলে উত্তরোত্তর চিত্ত-বিকারের বৃদ্ধি হইতে পারে, একারণ নগেন্দ্রনাথের পরিজনবর্গ তাহাকে বরদার সহিত বেড়াইতে যাইতে দেখিয়াও কোন প্রকার সন্দেহ করিতেন না।

যে দিবস মোহিনীর বাটীতে আহারাদি হয়, তাহার পর দিবস বরদার আগমনের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া সন্ধ্যার পরেই নগেন্দ্রনাথ, ভ্রমণচ্ছলে বাটীর বাহির হইল। অন্যান্য দিন বরদা আসিয়া নগেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া লইয়া যায়,—আজ নগেন্দ্রই, বরদার বাটীতে উপস্থিত। বরদার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাল বরদা বাবু! মোহিনীর স্বভাবচরিত্র কেমন? কাল হইতে আমার মন, যেন কেমন হইয়াছে, এতদিন মোহিনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কথাবার্ত্তাও হয় নাই, কিন্তু ভাই! তাহার সহিত আলাপ হওয়ায় মনে যেন অন্য ভাব দাঁড়াইয়াছে।

ব। আমি ভাই তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে তাহাদের বাটী হইতে চলিয়া আসিলাম। সে, তোমার সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছে, আমরা তো তাহা শুনিয়াছি, তবে তাহার জন্য তোমার মেজাজ খারাপ হইল কেন? আচ্ছা ভাই! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমায় মিথ্যা বলিও না, বলি—মোহিনীকে দেখিলে কেমন?

ন। না না তা নয়, আমি তাহার রূপের কথা বলিতেছি না—তাহার সহিত যে দুই একটা কথা কহিয়াছি, তাহাতেই আমার মন গলিয়া গিয়াছে।

ব। আগে রূপ, পরে গুণ। তুমি তাহার রূপের পরিচয় না দিয়া গুণের কথা কহিতেছে কেন?

ন। কেন, মোহিনী তো দেখিতেও সুন্দরী।

ব। তাই বল, রূপ না থাকিলে কি গুণের আদর হয়? মোহিনীর মত মেয়ে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, একে রূপবতী, তাহাতে তাহার যে গুণ আছে, বেশ্যার মধ্যে এ ভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার সহিত সুকুমারীর আলাপ ছিল, আমি তখন সর্ব্বদাই সুকুমারীর বাটীতে যাইতাম,—মোহিনী তখন বালিকা। আমি মোহিনীকে ছেলে-বেলা হইতেই দেখিতেছি। তোমাকে আর তাহার কথা কি জানাইব, সে এক কথায় গোবর-গাদার পদ্মফুল।

ন। বরদা বাবু! বাস্তবিকই আমি মোহিনীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি। আহা! মোহিনী যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহে জন্মিত, তাহা হইলে আজ তাহার সুখের সীমা থাকিত না; কিন্তু বেশ্যাগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অভাগিনীকে চির দিনের জন্য কলঙ্ক ভোগ করিতে হইবে। আমার মতে এরূপ অবস্থায় তাহার বিবাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ব। সুকুমারীকে তুমি সহজ মেয়ে মানুষ ভাবিও না। সে, মোহিনীর মন্তর মত বিবাহ দিয়াছিল, যদিও মোহিনীর স্বামী তাহাকে গৃহে লইয়া যায় নাই বটে, তথাচ ভবিষ্যতে মোহিনীর অদৃষ্টে সুখের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু কপাল-দোষে মোহিনী, এখন বালবিধবা, বিবাহের পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়।

ন। ভগবান্ যাহার অদৃষ্টে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাকে সেই

মতেই চলিতে হইবে। তুমি আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কি করিতে পারি? এখন আমি এক গোলযোগে পড়িয়াছি, আপনার সহিত মোহিনীর আলাপ পরিচয় আছে, এ কাজটী আপনাকেই করিতে হইবে। যাহা কিছু খরচপত্র হইবে, সমস্তই আমি দিব, কিন্তু কাজটীর ভার আপনার।

ব। কি! থিয়েটার দেখাইবার কথা? আমার দ্বারা সে কাজ হইবে না, কেন—তুমি একদিন তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া আন না! তাহাতে দোষ কি? মোহিনী, তোমার নিকট থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা বলিয়াছে, আমার বিবেচনায় তোমারই তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

ন। লইয়া যাইতে আমার বাধা নাই। তবে কি না, একে রাত্রিকাল, তাহাতে দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া থিয়েটারে যাইতে আমার যেন মন সরিতেছে না। কেবলমাত্র তাহাই নহে, আমার সহিত মোহিনী-দের আলাপ পরিচয় নাই, আপনার সঙ্গেই তাহাদের বাটীতে দুই তিন বার মাত্র গিয়াছি। মোহিনীর মাতা, সঙ্গে থাকিলে, আমি লইয়া যাইতে পারিতাম।

ব। তোমার যেমন বুদ্ধির দৌড়, তারা দু ব'নে আমোদ করতে যাবে, তোমার সঙ্গে; সুকুমারী তাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহারা আমোদ পাইবে কেন?

ন। বরদা বাবু! আমার কেমন লজ্জা করে, আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, এ কাজটীর—আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভার লউন।

ব। আমি ভাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার দ্বারা হ'বে না, তবে তুমি আমায় এ জন্য আকিঞ্চন জানাইতেছ কেন? দেখই না—মোহিনী তোমাকে কিরূপ ভাব ভক্তি দেখায়, কেমন ব্যবহার করে!

ন। বরদা বাবু! আমার মনের গতি এখন বড়ই চঞ্চল, হয়ত

এই থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যাইয়া মহা গোলযোগে পড়িতে পারি, তখন আমায় কে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে?

ব। কেন? মোহিনীর যদি মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পার, তাহা হইলে আলাপ রাখিতে দোষ কি? আলাপ হইলেই বা ভয় কি? আমি তোমার পিছনে আছি। স্থির জানিও তাহার বা সুকুমারীর এমন সাধ্য নাই যে, আমরা যাহা করিব, তাহার তাহারা অন্যথা করিতে পারে।

ন। বরদা বাবু! বলিতে কি, মোহিনীকে দেখিয়াই তাহার প্রতি আমার আসক্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র, সে মহৎ, আমি কোন অংশে তাহার যোগ্য নহি, কিরূপে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে?

ব। সে কথার পরে মীমাংসা হইবে, এখন তাহাদের থিয়েটার দেখাইতে চাহিয়াছ, এক দিন দেখাইয়া আন। তুমি নিজে দেখাইতে স্বীকার পাইয়াছ, না দেখাইলে তাহাদের নিকট তোমার অভদ্রতা হইবে। কথা ঠিক রাখিয়া কার্য্য কর, কোন দিকে কোন আশঙ্কাই নাই।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইল। মোহিনীর বাটীতে অদ্য নগেন্দ্রনাথের যাইতে ইচ্ছা থাকিলেও, বরদার কথা মত সে স্থানে না যাইয়া স্থানান্তরে যাওয়া হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অদ্য শনিবার, ষ্টার থিয়েটারে "লয়নামজ্‌নু" ও "কালাপানির" অভিনয়। নগেন্দ্রনাথ, মোহিনী ও যামিনীকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার দেখাইবে, ইতিপূর্ব্বেই যাইবার সকল বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছে। যখন যে কোন রঙ্গভূমিতে নূতন নাটকের অভিনয় হয়, নগেন্দ্রনাথ প্রায়ই প্রথম রজনীতে অভিনয় দেখিয়া আইসে, উক্ত দুই খানি পুস্তকেরই অভিনয় বহু দিবস

পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে হইয়া গিয়াছে, একারণ নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সে দুই খানি নূতন নহে; কিন্তু যাহারা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে নূতন, নগেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে অভিনয় দেখাইবার জন্য বরদাকে পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন করিয়াছিল, কিন্তু বরদা তাহার কথায় সম্মত না হওয়ায়, নগেন্দ্রনাথকেই লইয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

দিন দিন একত্র বসা দাঁড়ানয় রমণের সহিত নগেন্দ্রনাথের এক্ষণে সখ্যতা বাড়িয়াছে, এদিকে নগেন্দ্র থিয়েটার দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, ওদিকে স্থানান্তরে রমণের সহিত আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। নগেন্দ্র যে ধাতুতে গঠিত, তাহাতে কোন পক্ষের আবেদন উপেক্ষিত হইবার নহে। নগেন্দ্র বাটী হইতে যথাকালে আহারাদি করিয়া ব্যগ্রভাবে সুকুমারীর বাটীতে উপস্থিত হইল, ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র যে কয়েক দফা সুকুমারীর বাটীতে আসিয়াছিল, প্রতিবারেই বরদা তাহার সঙ্গে ছিল; বরদাকে সঙ্গে না লইয়া আজ সর্ব্ব প্রথম নগেন্দ্র সে বাটীতে প্রবেশ করিল।

আহারাদি করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেই আটটা বাজিয়াছিল, এজন্য নগেন্দ্র সুকুমারীর বাটীতে আসন গ্রহণ করিতে না করিতে, সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। সুকুমারী ব্যতীত সে সময়ে নগেন্দ্রের সমক্ষে আর কেহই উপস্থিত ছিল না। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মোহিনীদের থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা আছে, তাহাদের যাওয়া হইবে কি?"

সু। তাহারা তো উদ্যোগী হইয়া আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

ন। তবে একখানা গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করুন, রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

নগেন্দ্রের কথায় সুকুমারী গৃহের বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়ার জন্য লোক পাঠাইয়া দিল। মোহিনী ও যামিনী উভয়েই বেশভূষায় সজ্জিতা

হইয়া নগেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল, তাম্বুলাদি তাহারা সকলই প্রস্তুত রাখিয়াছিল। কার্য্যান্তরে সুকুমারী গৃহের বাহিরে আসিলে—সুযোগ মতে মোহিনী তাম্বুল পূর্ণ একটী ডিবা নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে রাখিয়া, তদ্দণ্ডে গৃহের বাহিরে আসিল! মোহিনীকে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ সচকিতে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু পরস্পর কোন বাক্যালাপ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারী নগেন্দ্রের নিকটে আসিয়া বসিলে, যুবক বলিল, "আপনিও থিয়েটার দেখিতে চলুন না কেন?"

সু। না, আমি যাইব না, আপনারা যাইতেছেন—যান। ঠাকুর দেবতার পালা হয় তো বরং এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করে।

ন। আপনি যাইলে আর কোন গোলযোগ থাকিত না।

সু। কেন? গোল কিসের? আমি আপনাকে যথেষ্ট মান্য করি, আপনার সহিত আমার মেয়েরা যাইতেছে, তাহাতে আবার গোলমাল কি? আমিত আর যার তার সঙ্গে মেয়েদের পাঠাইতেছি না, আপনাকে আমার বিশ্বাস আছে।

ন। আপনি তো আমাকে বাড়াইতেছেন, কিন্তু আমি যদি অবিশ্বাসের কাজ করি?

সু। সে ভয় আমি রাখি না। মোহিনী আপনাকে পান দিয়াছে, আপনি গ্রহণ করেন নাই?

ন। রাখিয়া গিয়াছেন মাত্র, আমাকে তো খাইতে বলেন নাই।

সু। খাবার জিনিষ সামনে ধরিলে, খাইবার জন্যই বুঝিতে হয়। আপনি ডিবা খুলিয়া পান খান।

সুকুমারীর কথায় নগেন্দ্রনাথ ডিবা হইতে একটী পান লইয়া মুখে দিলেন।

এদিকে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। যামিনী ও মোহিনী শশব্যস্তে দ্বার

দেশে আসিয়া দাঁড়াইল, নগেন্দ্রনাথ ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় জানাইল। আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া সত্বর ভাবে তিন জনেই বাটী হইতে বাহির হইল, সুকুমারী তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেল।

নগেন্দ্রনাথের লোকলজ্জা সমাজ-ভয় বিলক্ষণ থাকায়, সুকুমারীর বাটী হইতে আসিয়া যুবক দ্রুতবেগে গাড়ীতে উঠিয়া একপার্শ্বের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, অপর দরজার কতকাংশ মোহিনী ও যামিনীর আরোহণ জন্য উন্মুক্ত রহিল। দুই ভগ্নী অনতিবিলম্বে গাড়ীতে আরোহণ করিলে, নগেন্দ্রনাথ এ দ্বারটীও এককালে রুদ্ধ করিল, চালক গন্তব্য পথে শকট চালাইল।

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে নগেন্দ্রের হস্ত সহসা মোহিনীর গাত্রে পতিত হওয়ায় রমণী অতি যতনে যুবকের হস্তখানি ধরিল। নগেন্দ্রনাথের সহিত মোহিনীর তখন বিশেষ আলাপ পরিচয় কিছুই হয় নাই। শকট মধ্যে অন্ধকারে মোহিনীর হস্ত স্পর্শ করিয়া যুবক অতুল আনন্দ উপভোগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বশরীর কি যেন অমিয় রসে স্নিগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে সুখ তাহাকে অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না, অবিলম্বে শকট-খানি থিয়েটারের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিল। নগেন্দ্র বিশেষ সতর্কে গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া দিয়া, চালককে গাড়ী খানি স্ত্রীলোক-দিগের প্রবেশ-দ্বারে লইয়া যাইতে বলিয়া দুখানি টিকিট আনিয়া তাহাদের হস্তে দিলেন। মোহিনী ও যামিনী গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বার-রক্ষিকার হস্তে সেই দর্শনী-পত্র দিয়া প্রবেশ দ্বারে ঢুকিল। নগেন্দ্র গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আপনার জন্য একখানি টিকিট লইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিলেন।

রঙ্গভূমির অভিনয় আনন্দপ্রদ হইলেও, নগেন্দ্রনাথের হৃদয় এক্ষণে

সে আহ্লাদে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। বরদা ও রমণের অভাবে যুবক ধৈর্য্যচ্যুত হইল, তাহাতে আজ কামিনীর বাটীতে গীতবাদ্য শ্রবণের নিমন্ত্রণ রহিয়াছে, বরদা ও রমণ এবং অন্যান্য বন্ধুগণের তথায় সমাগম হইয়াছে, তাহারা কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, আর নগেন্দ্র একাকী রঙ্গভূমির অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। নগেন্দ্র সে আমোদ প্রমোদে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত ও অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, একারণ যুবক অর্দ্ধঘণ্টা কাল মাত্র থিয়েটারে থাকিয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে, কামিনীর বাটীর দিকে চলিল। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে মোহিনীর কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, নগেন্দ্র ভাবিল—যদি থিয়েটারটী নিকটে না হইয়া আরো দূরে হইত, তাহা হইলে রমণীর অঙ্গস্পর্শে যে আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া ছিল, তাহা বিদ্যুৎ প্রায় বিকাশ মাত্রেই নীমিলিত হইত না, সুদীর্ঘ সময়ে মোহিনীর মনোগত অভিপ্রায়েরও কথঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারিত, কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্টে সে সুখ লেখেন নাই, তাই মুহূর্ত্ত বিকাশের পরক্ষণেই বিলীন হইল। মোহিনীর কি মোহিনী শক্তি, যতই তাহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, উত্তরোত্তর ততই তাহার ভাবে আমার মন যেন গলিয়া যাইতেছে, সে কি আমাকে প্রকৃতই অনুরাগ-চক্ষে দেখিয়া থাকে ? না, এ আমার মনের ভ্রান্তি, আমি মোহিনীর বিষয় যতই মনে মনে আন্দোলন করিতে থাকি, ততই যেন আত্মহারা হইয়া যাই ! কিন্তু তাহার সহিত আমারতো সে সম্বন্ধ হয় নাই, যাহাতে একের প্রাণ অন্যের প্রাণে মিশিতে চায় ? তবে, মোহিনী আমার এরূপ মন ভুলাইল কেন ? কেন মোহিনীকে দেখিয়া আমি আত্মহারা হই—দিবা রাত্রি তাহাকে নয়নে নয়নে রাখিতে সাধ হয়, তাহার অভাবে আমার মন প্রাণ কেনইবা কাঁদিয়া উঠে ?

আসিবার সময়ে নগেন্দ্রনাথের নিমিষের জন্য যে সুখ সম্ভোগ হইয়াছে, যাইবার কালে আর একবার হয় তো সেই আনন্দ লাভ হইতে পারে,

কিন্তু সে সুখসম্মিলন সম্পূর্ণরূপে মন্মোহিনী মোহিনীর হস্তে নির্ভর করিতেছে। মোহিনী যদি বাটী আসিবার কালে সালজ্জে তাহার প্রতি সে পূর্ব্বানুরাগ না দেখায়, তাহা হইলেই তাহার সকল আশা ভরসা ব্যর্থ হইল। এইরূপ মোহিনীর বিষয়ে মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে, নগেন্দ্রনাথ কামিনীর বাটীতে পৌঁছিল। কামিনীর সহিত রমণের প্রগাঢ় প্রণয়, সেই অনুরাগে নগেন্দ্রনাথ ও বরদার নূতন আলাপ হইয়াছে; বরদা ও নগেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই সুচতুরা কামিনী তাঁহাদিগের স্বভাব চরিত্র ভাব ভক্তি সকলই বুঝিয়াছিল, রমণের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে মিলিত হইয়া বন্ধুদ্বয় তাহার বাটীতে আসিত বটে, কিন্তু তাহারা তথায় আসিলেই কোন কোন বাবদে কিছু খরচপত্র করিয়া যাইত, এ বিষয়ে নগেন্দ্র বা বরদা কোন অংশেই কৃপণতা দেখাইত না। একারণ কামিনীও তাহাদের বিশেষ খাতির যত্ন করিত।

নগেন্দ্রনাথ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে না হইতে, কামিনী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে খাতির যত্ন করিয়া আসরে বসাইল। নগেন্দ্র গৃহমধ্যে এদিক ওদিকে অনেকগুলি পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইল, বরদা মদ্যপানে ব্যস্ত রহিয়াছে, নিশিকান্ত হার্ম্মোনিয়মে সুর দিতেছে, আমোদ আহ্লাদে গৃহটী বেশ সরগরম রহিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের পক্ষে নির্জ্জনতাই মনোরম স্থান, তথাচ বহুক্ষণ প্রাণের বন্ধু বরদার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহাতে কামিনীর কোমল কণ্ঠে সঙ্গীতালাপে যুবকের মন মোহিত হইল।

কামিনীর গৃহে সে দিবস আহারাদিরও ব্যবস্থা ছিল, মদ্যপায়ীগণ সুরাপানে চৈতন্য হারাইলে, কামিনী স্বহস্তে কয়েক খানি মাংস পূর্ণ ডিস তাহাদের সম্মুখে সাজাইয়া দিল, রমণ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ কার্য্যে কামিনীর সহায়তা করিল। নগেন্দ্রনাথের সুরার প্রতি চিরবিদ্বেষ, সংসর্গ দোষে সময়ে সময়ে তাহাকে মদ্যপায়ী বন্ধুগুলীর সহিত মিশিতে হয়,

কিন্তু মদিরা পানে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। কামিনী নগেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ পরিচয়েই তাহার স্বভাব সবিশেষ বুঝিয়াছিল, রমণী পৃথক একখানি ডিসে কতকটা মাংস ও কয়েক খানি লুচি এবং দুই একটা মিষ্ট সামগ্রী সাজাইয়া নগেন্দ্রকে খাইবার জন্য আকিঞ্চন করিল। নগেন্দ্রনাথ আহারে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না! গৃহে সঙ্গীতের রোল উঠিতেছে, আনন্দের উৎস ছুটিতেছে; নগেন্দ্র-নাথের একান্ত ইচ্ছা যে, সে আমোদে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া আসিবে না, কিন্তু তাহার মস্তকে যে গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, স্বয়ং ব্যতিরেকে অন্যের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। মোহিনী ও যামিনীকে লইয়া থিয়েটারে রাখিয়া নগেন্দ্রনাথ কামিনীর বাটীর আমোদ প্রমোদে যোগ দিয়াছে, যথা সময়ে থিয়েটারে উপস্থিত হইতে না পারিলে, বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে গাড়ীর মধ্যে মোহিনী যে ভাবে যুবকের হৃদয় বিচলিত করিয়াছে, আসিবার সময়ে সে ভাবের পুনর্বিকাশ দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ বিশেষ উৎসুক রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায়, নগেন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইল।

নগেন্দ্রনাথ কামিনীর বাটী হইতে বাহির হইবার সময়ে একটা বাজিল, যুবক ভাবিল, হয়ত এতক্ষণে অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে, মোহিনী ও যামিনী তাহার অদর্শনে মহা গোলযোগে পড়িয়াছে, তাহারা তাহাকে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছে, তাহার দেখা না পাইলে কিরূপে বাটী আসিবে—নগেন্দ্র এইরূপ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে, দ্রুতপদে রঙ্গালয়ে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল—তখনও কালাপানির অভিনয় শেষ হয় নাই। সদা সর্ব্বদা থিয়েটারে যাতায়াত কারণ নগেন্দ্রনাথের সহিত থিয়েটারের লোক জনের সঙ্গেও জানা শুনা

ছিল, নগেন্দ্র একবারমাত্র নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া, পরক্ষণে গাড়ী ঠিক করিবার জন্য বাহিরে আসিল। থিয়েটারের দ্বারবানের সহিত দেখা হওয়ায়, তাহাকে সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় অভিনয় দেখিতে বসিল, কিন্তু তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নগেন্দ্র ক্ষণকাল মাত্র তথায় থাকিয়া পুনরায় বাহিরে আসিল, নির্দ্ধারিত গাড়ীখানি স্ত্রীলোক-দিগের প্রবেশ-দ্বারের সমক্ষে রাখিয়া মোহিনী ও যামিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অভিনয় শেষ হইলেই, নগেন্দ্রনাথের কথা মত প্রবেশ-দ্বারের রক্ষিকা যামিনী ও মোহিনীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। আরোহী লইয়া শকটখানি ফটকের বাহিরে আসিলে, নগেন্দ্রনাথ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কেমন দেখিলে ?" নগেন্দ্র, মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিল বটে, কিন্তু যামিনী তাহার কথায় প্রত্যুত্তর করিল, "লয়লা-মজনুর অভিনয় আমায় ভাল লাগে নাই।"

ন। কেন ? অমন ভালবাসার ছড়াছড়ি, হাসি তামাসার গট্‌রা—তোমাকে ভাল লাগিল না ? ভাল, মোহিনি ! তুমি অভিনয় দেখিলে কেমন ?

মো। বড় মন্দ নয়।

ন। যাহা হউক, তোমরা থিয়েটার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে, আমার কার্য্য আমি করিলাম।

এই কয়েকটী কথাবার্ত্তার পরে সকলেই নীরব হইল। মোহিনী ও যামিনী গাড়ীর একদিকে, অন্য পার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্র দেখিল—উহাদের একজন গাড়ীর খড়খড়িতে ঠেশ দিয়া রহিয়াছে, আসিবার সময়ে মোহিনীর হস্তে হস্ত দিয়া নগেন্দ্রনাথের যে সুখানুভব হইয়াছিল, এখন যুবকের সেই সাধ পূর্ণ করিবার আশা বলবতী হইয়াছে, কিন্তু সহসা মোহিনীর করস্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না, নগেন্দ্র অগ্রসর হইয়াও অপ্রতিভ হইল।

কিন্তু বলবতী আশার উত্তেজনায় আর নিবৃত্ত হইতে না পারিয়া, কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "মোহিনি! ঘুমাইলে না কি?"

নগেন্দ্র ভাবিয়াছিল যে, যামিনী যদি তন্দ্রাগতা হইয়া থাকে, এই সাবকাশে মোহিনীর সহিত ইঙ্গিতে দুই একটী বাক্যালাপ করিবে, কিন্তু তাহার মনের আশা মনেই মিলাইল, তাহার কথায় যামিনী উত্তর করিল, "না, আমি ঘুমাই নাই, মোহিনী ঠেশ দিয়া ঘুমাইতেছে।"

নগেন্দ্রনাথ মোহিনী ভাবিয়া যামিনীর গাত্রে হস্ত দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কথা স্বরে যামিনীর পরিচয় পাইয়া ক্ষান্ত হইল, কিন্তু তাহার সর্ব্ব শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে শকট খানি মোহিনীদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, নগেন্দ্রনাথ বিশেষ যত্নের সহিত উভয়কে গাড়ী হইতে নামাইয়া দ্বারোদঘাটন জন্য দরজায় করাঘাত করিল। তন্দ্রাবস্থায় সুকুমারী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, কিন্তু প্রবীণা তথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। যামিনী বাটীতে প্রবেশ করিল, মোহিনী দ্বারদেশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করায় নগেন্দ্র বলিল, "যাও মোহিনি! বাটীর ভিতরে যাও, তুমি দরজা বন্ধ করিলে, আমি এখান হইতে যাইব, কোন ভয় নাই, আমি দাঁড়াইয়া আছি। তোমরা উপরে উঠিয়া সাড়া দিও, তবে আমি যাইব।"

মো। আপনি একবার আমাদের বাটীতে আসুন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাটীতে যাইবেন।

ন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আজ বিদায় হই, আর একদিন আসিয়া দেখা করিব।

মো। আমি আপনাকে কিছুক্ষণ রাখিয়াই বিদায় দিব, আমার কথা রাখুন।

মোহিনীর কথায় আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া যুবক, রমণীর পশ্চাৎ-

বর্ত্তী হইল। মোহিনীর গৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। নগেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে যে কয়েক বার মোহিনীদের বাটীতে আসিয়াছিল, প্রতি বারেই মোহিনীর গৃহে বসিয়াছিল, উপরে উঠিয়াই মোহিনীর গৃহ, গৃহদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। শরতের আকাশে চন্দ্র ও তারকা-পুঞ্জ সুশীতল কর-ধারা বর্ষণ করিতেছে, জানালা দরজা উন্মুক্ত থাকায় গৃহে স্বতন্ত্র আলোকের প্রয়োজন ছিল না। অন্য দিন আসিয়া নগেন্দ্রনাথ মোহিনীর খাটের পার্শ্বস্থ নিম্ন শয্যায় উপবেশন করিত, আজ কিন্তু সে শয্যা প্রস্তুত না থাকায়, যুবক ক্ষণকালের জন্য গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল। মোহিনী সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নগেন্দ্রনাথকে শয্যায় বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রনাথ রমণীর কথা উপেক্ষা না করিয়া, পা ঝুলাইয়া খাটেই উপবেশন করিল।

মোহিনী যেরূপ বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া রঙ্গালয়ে যাইয়াছিল, বাটী আসিয়া সে সকল বস্ত্রাদি কিছুই ত্যাগ করিল না, নগেন্দ্রনাথ শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র, রমণী কোন কথাবার্ত্তা ব্যতিরেকে সত্বর দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া, এক কালে নগেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল। যুবক ইতি-পূর্ব্বেই রমণীর রূপলাবণ্যে আত্মহারা হইয়াছিল, কিন্তু মোহিনীর মাতাকে নগেন্দ্র বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিত, সহসা মোহিনীর এরূপ ভাব দেখিয়া নগেন্দ্র আত্মসংযমে সচেষ্টিত হইল। মোহিনীর এরূপ আকিঞ্চনে সমর্থন না দেখাইয়া যুবক বলিল, "মোহিনি! কেন তুমি এমন করিতেছ? দেখ, তুমি আমায় আসিতে বলিলে, আমি আসিয়াছি, তোমার কথা রাখিয়াছি, এখন আমায় বিদায় দাও, অন্য সময়ে তোমার সহিত দেখা করিব।"

মো। আপনি আমায় থিয়েটার দেখাইতে লইয়া গেলেন কেন? যদি লইয়া গেলেন, তবে কি অভিনয় দেখাইলেন! যদি দেখাইলেন, আমার মন খারাপ করিয়া দিলেন কেন?

ন। সে কি মোহিনি! আমি তোমাদের আকিঞ্চনে তোমাদের থিয়েটার দেখাইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে অপরাধী করিতেছ কেন? লয়নামজনুর অভিনয় প্রেমপূর্ণ, হয় তো অভিনয় দেখিয়া তোমার এরূপ মনোবিকার হইয়াছে। কাপড় ছাড়, মুখে হাতে জল দাও, এখনই কতকটা ঠাণ্ডা হইবে; তুমি এরূপ অশান্ত ও উতলা ভাব দেখাইতেছ কেন? আমি কি তোমার মা'কে এ ঘরে ডাকিয়া দিব?

মো। না, না—আমার কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, আমি যে কাপড় পরিয়া আছি—ইহা পরিয়াই থাকিব, আমার কাপড় ছাড়িবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রাণের ভিতর যে কেমন করিতেছে, যদি দেখাইবার হইত, এই দণ্ডে দেখাইতাম। নগেন বাবু! বাড়ী যাইবার জন্য আমাকে আর কোন কথা শুনাইবেন না, আপনি আর কিছুক্ষণ এখানে থাকুন, আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কতকটা ঠাণ্ডা হইতে পারে, আমার এ মন বিকারের আপনিই কারণ। আপনি আমায় দর্শন সাধে বঞ্চিত করিবেন না।

ন। মোহিনি! তুমি কি বলিতেছ—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল, যদি আমায় যাইতে নিষেধ কর, আমি এখানেই অপেক্ষা করিতেছি। তোমাকে প্রকৃতস্থ না দেখিয়া, আমি বিদায় হইব না। এ ঘরে কি জল আছে?

মো। কেন? আপনি কি খাইবেন?

ন। না, তোমার জন্য, আমি তোমার মুখে হাতে জল দিই, তুমি কতকটা ঠাণ্ডা হইবে।

মো। না, আমার জলের প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে দেখিয়াই ঠাণ্ডা হইতেছি। আপনি জুতা খুলুন, গায়ের জামা খুলিয়া রাখুন; আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; আমার সর্ব্ব শরীরে যেন

অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, এ আগুন জল-সিঞ্চনে নিবিবে না। আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমি আপনাকে যাহা করিতে বলিলাম, আপনি তাহাই করুন।

মোহিনীর কথায় নগেন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকতর কাঁপিয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথ—মোহিনী বারাঙ্গনা-গর্ব্ভজাতা হইলেও—তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকে, সহসা মোহিনীর কেন এরূপ মনোভাব হইল, রমণী কি জন্য তাহাকে এরূপ অনুনয় বিনয়ে তাহার গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, একে রাত্রি, তাহাতে রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুকুমারী, যামিনী বা অন্য কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, এ গভীর রজনীতে সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, প্রকৃতি রাণী সুষুপ্তা, এরূপ নীরব নিস্তব্ধ সময়ে মোহিনীর সহিত এরূপ ভাবে একত্র এক গৃহে অবস্থান করিতেও তাহার যেন সাহস কুলাইতেছে না। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই যুবককে যেন সতর্ক থাকিবার জন্য সাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু মোহিনীর বর্ত্তমান ভাব গতি দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ মনের ভাব মনেই সম্বরণ করিতেছে, সাধ্যমত রমণীকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতেছে। মোহিনী সে সকল কথা আদৌ কর্ণগোচর করিতেছে না, সে আপনার ভাবেই বিহ্বলা রহিয়াছে।

বারম্বার অনুরোধে নগেন্দ্র জামাটী খুলিয়া না রাখায়, মোহিনী স্বয়ং তাহার বোতাম গুলি খুলিয়া গাত্র হইতে পিরাণটী খুলিয়া লইয়া, ঘড়ীর তাকে ঝুলাইয়া দিল। রমণীর অশান্ত ভাব দেখিয়া নগেন্দ্র স্বয়ং পাদদেশ হইতে জুতা জোড়াটী খুলিয়া খাটের নিম্নে রাখিল। মোহিনী যে সাজে সজ্জিতা ছিল, সেই অবস্থাতেই নগেন্দ্রনাথের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যুবক এখনও বসিয়াছিল, মোহিনীর চাপে নত হইয়া পড়িল। রমণীর অভিসন্ধি যুবকের নিকট তখন আর কিছুই অব্যক্ত রহিল না, মোহিনীর

অঙ্গরাখা স্পর্শে নগেন্দ্র দেখিল যে, যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বরিষার বারিধারার ন্যায় ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ সাদর সম্ভাষণে বলিল, "মোহিনি! আমার গাত্র হইতে জামাটী খুলিয়া লইলে, দেখ—আমার অপেক্ষা তোমার অধিক ঘাম হইয়াছে, তুমি বডিটী খুলিয়া ফেল।"

মো। না—আমি খুলিব না।

ন। তবে কি আমি খুলিয়া দিব?

মো। সে আপনার ইচ্ছা! এখন আমি আর আমার নাই, সকল ঐ চরণে উৎসর্গ করিয়াছি। নগেন্দ্র! আজ আমায় রক্ষা কর। আমি বড় বিপন্না, বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার সহিত থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।

ন। কেন মোহিনি! তুমি আমাকে অপরাধী করিতেছ কেন? আমার দোষ কি?

মো। দোষ তোমার চক্ষু দুইটীর, ওই চক্ষুই আমাকে আজ পাগলিনী করিয়াছে, আর আমায় বঞ্চনা করিও না, আমার মন সাধ পূর্ণ কর।

নগেন্দ্রনাথ সস্নেহে সাদরে মোহিনীর গাত্র হইতে অঙ্গরাখাটী খুলিতে লাগিল; কিন্তু বন্ধন স্থান গুলি উন্মুক্ত করিবার সাবকাশ হইল না, মোহিনী বলপ্রয়োগে হুক্‌গুলি ছিঁড়িয়া, তদ্দণ্ডে অঙ্গরাখাটী ভূমিতলে ফেলিয়া দিল।

ন। মোহিনি! কেন এই রূপ দেখাইতেছ? আমি তোমার অঙ্গরাখাটী খুলিয়া দিতেছিলাম, আস্তে আস্তে খুলিলে—হুকের ঘরা গুলি নষ্ট হইত না।

মো। নগেন্দ্র! আমায় তুমি মারিয়া ফেলিয়াছ, আমার জামায় প্রয়োজন কি? তোমার চক্ষুই আমার কাল।

নগেন্দ্রনাথ মোহিনীর কথায় এবার আর কোন উত্তর করিল না। পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচা দিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ, বক্ষস্থল ও মুখ মুছাইয়া দিতে

আরম্ভ করিল। মোহিনী নগেন্দ্রের কার্য্যে বাধা দিয়া বলিল, "না, আর নয়, আর আমাকে আদর যত্ন করিতে হইবে না, যদি তোমার এ ভাব পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, বুঝিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে কি এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত? তুমি আশ্রিতা লতাকে সমূলে তুলিয়া ফেলিয়া জল সিঞ্চন করিতে বসিয়াছ।

ন। মোহিনি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। জানিনা তোমার নিকট কেন অপরাধী, যাহা হউক যদি কোন বিষয়ে কোন দোষ দেখিয়া থাক, আমায় মার্জ্জনা কর।

মো। আপনার অপরাধ কি? অপরাধ আমার, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! নতুবা প্রত্যাখ্যাত রমণীকে আপনি এখনও উপেক্ষা করিতেছেন?

ন। মোহিনি! শান্ত হও, আমার কথা শুন। তুমি যে জন্য আমাকে অপরাধী করিতেছ, অবশ্য স্বীকার করি, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ দোষী হইতেছি, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, আমি তোমায় ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকি, তোমার মাতা আমাকে বিশেষ ভালবাসেন, আদর যত্ন করেন, আজ যদি তোমার কথায় আমি আত্ম বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে পরিণামে কি হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি! তোমার মাতার নিকট আমার ও তোমার উভয়েরই মাথা হেঁট হইবে। তিনি যে আমাকে বিশেষ চরিত্রবান বলিয়া জানেন, মান্য করেন, আজ তোমার কথায় স্বীকৃত হইলে—আমার সে নামে কলঙ্ক পড়িবে।

মো। সে সকল ভাবনা আপনার নহে—আমার। আমি যখন আপনাকে আকিঞ্চন অনুরোধ করিয়া ঘরে বসাইয়াছি, মা কি আমার অভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই! আপনার এ সকল ওজর আপত্তি কথার কথা, আমার বিবেচনায় আপনার লোককে কাঁদানই স্বভাব,

ভাল—আপনি যদি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমি আপনাকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।

ন। মোহিনি! আর তুমি আমায় লজ্জিত করিও না। তোমার ভুবনমোহিনী রূপে আমি তো কোন ছার, কত রূপবান পুরুষের মন আকুল হইয়া উঠে। যাহা হউক, আর আমি তোমাকে অসুখী করিব না, আমার অদৃষ্টে যাহা হউক না কেন, আমি তোমায় আমার আমিত্ব দিলাম, তোমার কথায় আর আমি কোন দ্বিরুক্তি করিব না। আমার কায় মন সর্ব্বস্ব তোমায় দিলাম, আমি তোমায় অবজ্ঞা করিব কি? তোমার মত রূপবতী নারীর সহিত আলাপ পরিচয়—ইহাও আমার সৌভাগ্যের কথা। যে দিন হইতে স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, পতিপ্রাণা সতী জন্মের মত বিদায় দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমার হৃদয়ে যে গুরুতর অভাব ছিল, আজ তোমার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমার যেন সে ভাব আর কিছুই নাই। তুমি মানবী হইলেও আমি তোমাকে দেবীভাবে দেখিতাম, তোমার সহিত কথা কহিতে আমার সাহস কুলাইত না। আজ তুমি যে অযাচিত ভাবে আমাকে এরূপ আদর করিবে, অনুরাগ দেখাইবে—এ আশা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বপ্নে ভাবি নাই।

মো। আপনি বিদ্বান্—আমি মূর্খ। আপনার সহিত বাক্‌যুদ্ধে আমায় পরাস্ত স্বীকার করিতে হইবে, আপনাকে হারাইতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। এখন একবার আমার হৃদয়ে আসুন, এ তাপিত প্রাণ আপনার আলিঙ্গনে শীতল করি।

ন। মোহিনি!

মো। এখনও তোমার সন্দেহ? ধিক্ আমায় ধিক্! আমি কি অন্যায় করিয়াছি, যে কষ্ট এ জীবনে ক্ষণেকের জন্যও সহ্য করিতে হয় নাই,

নিষ্ঠুর নগেন্দ্র! আজ আমায় সেই মনস্তাপে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়াও কি তোমার মনস্তৃপ্তি হইল না?

মোহিনীর নেত্রদ্বয় দিয়া অবিরল ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র সোহাগে তাহাকে বক্ষে লইয়া নয়নধারা মুছাইল। নগেন্দ্র-নাথের বক্ষে মোহিনী স্থান পাইয়া যেন সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। নগেন্দ্র বলিল, "মোহিনি! আমার ভাগ্যে এ সুখ কতক্ষণের জন্য! রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঐ শুন—পক্ষীগণ প্রভাত সঙ্গীতে মাতিয়াছে, রজনীর অন্ধকার হ্রাস হইয়া আসিয়াছে—ক্ষণেকের জন্য এরূপ আমোদ উপভোগ করাইয়া আমার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত করিলে মাত্র।

মো। তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে! আমি আজ যে চক্ষে তোমায় দেখিয়াছি, প্রাণ থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না। ভাল, তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আবার বিবাহ করিবে?

ন। আমার ইচ্ছা, বিবাহ করিব না, কিন্তু পিতা মাতার অনুরোধ, তাহাতে আত্মবঞ্চনা, পরিণামে কি দাঁড়ায়, তাহার আমি কি উত্তর দিব?

মো। আমার একটী কথা রাখিবে?

ন। যদি রাখিবার হয়, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

মো। আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, আর বিবাহ করিবে না। দেখ, লোকে ছেলে মেয়ের জন্য বিবাহ করে, ভগবানের কৃপায় শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তোমার সে অভাব পূরণ হইয়াছে। এখন যদি তুমি বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার ছেলে মেয়ের কষ্টের সীমা থাকিবে না। তুমি পুরুষ মানুষ, যখন যাহা মনে হইবে, করিতে পার; কিন্তু সাধ করিয়া আর পায়ে বেড়ী দিও না, পুত্র কন্যাকে পর করিও না।

ন। মোহিনি! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বিবাহ করিব না, কিন্তু আমার বিবাহের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

মো। নগেন্দ্র! আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ঈশ্বর সমক্ষে আমি সত্য করিতেছি যে, এজীবনে তোমার সহিত আমার কখন বিচ্ছেদ হইবে না। তুমি আমায় ত্যাগ করিলেও, আমি তোমায় ভুলিব না।

ন। মোহিনি! তুমি এ সকল কি বলিতেছ? তুমি যুবতী, এ সময়ে উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, পরিণামে কষ্ট পাইতে হইবে। আমার প্রতি তুমি নির্ভর করিয়া সুখী হইবে না তো। আমার অবস্থা তোমাদের অবিদিত নাই, আমি তোমাকে কয় দিন প্রতিপালন করিতে পারিব? কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ? তোমার কথায় আমার যে কষ্ট হইতেছে।

মো। দেখ, পৃথিবীতে সকলেই মনের সুখের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, আজ তোমাকে পাইয়া যে সুখ পাইয়াছি, তাহার আর তুলনা নাই। টাকা মনে করিলে যথেষ্ট উপায় করিতে পারি, কিন্তু তোমার সমক্ষে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার সে কামনা এখন নাই। আমি তোমায় পাইয়া সুখী. তোমার পায়ে ধরি, আমায় এ সুখে বঞ্চিত করিও না—সাধে বাদ সাধিও না।

ন। মোহিনি! তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, তাই অমন কথা বলিতেছ, দেখ—যখন উদরের অন্ন, পরিধেয় বস্ত্রের জন্য অভাব ঘটিবে, অবশ্য তোমায় ভাবিতে হইবে, তখন এ সকল কথা কিছুই মনে থাকিবে না।

মো। আমি তোমার নিকট পয়সার প্রত্যাশী হইয়া প্রেম ভিক্ষা করি নাই, আমি তোমার প্রার্থী হইয়া, বহুকষ্টে তোমায় পাইয়াছি, তোমাকে লইয়া দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিব, তথাপি তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।

ন। আচ্ছা মোহিনি! আমার সাধ্য মত তোমার কথা রাখিব।

তুমি আজ আমায় যে ভাব দেখাইয়াছ, স্থির জানিও আমিও ইহা সহজে ভুলিতে পারিব না। নিশা অবশান প্রায়, পূর্ব্ব দিকে অরুণদেবের আরক্তিম আভা বিকাশ হইয়াছে, অবিলম্বে সূর্য্যদেব আকাশে দেখা দিবেন। আমায় এখন বিদায় দাও।

মো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাকে রাখিবার আমার সাধ্য নাই, আর অধিক কি জানাইব, আমায় স্মরণ রাখিও।

নগেন্দ্রনাথ মোহিনীকে আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, তাক হইতে উড়ানি ও নিপিরাণটী লইয়া পকেট হইতে চারিটী টাকা বাহির করিয়া, মোহিনীর অজ্ঞাত সারে উপাধানের নিম্নে রাখিয়া, "তবে এখন বিদায়" এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার শশধর গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া রজনীর অন্ধকার নাশ করিতেছে, ধরাতল স্নিগ্ধালোকে আলোকিত হইতেছে, বৈশাখী মৃদুমন্দ গন্ধবহ প্রফুল্ল প্রসূন রাজির সুরভি রাশি ইতস্ততঃ বহিতেছে, গ্রীষ্মের আতিশয্যে নর নারী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেও সান্ধ্য সমীরণ সেবনে সকলের শ্রান্তি দূর হইতেছে, চন্দ্রিমায় বসুন্ধরা সুচারু শোভায় সাজিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ এক সময়ে স্বভাবের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইত, বিশ্বনিয়ন্তার চিন্তা করিত, কিন্তু এখন তাহার মনের গতি ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে, প্রাকৃতিক শোভায় তাহার আর তাদৃশ আনন্দ বোধ হয় না। দিনে দিনে নগেন্দ্র অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, এক সময়ে যুবক যে বেশ্যালয়ের দ্বারদেশে আসিলে কুণ্ঠিত হইত, এখন তাহাতে তাহার ঘৃণা নাই; মোহিনীর মোহিনী শক্তিতে অভাগা এতই তন্ময় ও মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে,

বেশ্যালয়ে গমন তাহার নিত্য কার্য্যে পরিগণিত হইয়াছে। চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিলেও নগেন্দ্র এতদিন বারাঙ্গনা-প্রেমে আসক্ত হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সে শক্তি, সে ধৈর্য্য লোপ পাইয়াছে, দুর্ভাগা গৃহলক্ষ্মীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কুলটার ছলনায় আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। পরকে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিবে না, মনে মনে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলেও, সে লক্ষ্য সে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞাত সারে কুহকিনী তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াছে। এখন মোহিনীর হস্তেই নগেন্দ্রের জীবন মরণ, মোহিনীর আজ্ঞায় নগেন্দ্রকে উঠিতে বসিতে হয়, নগেন্দ্রের মনে মনে স্পর্দ্ধা যে, বেশ্যাপ্রেমে সে বিক্রীত হয় নাই, অসাহায় রমণীর উদ্ধার মানসে এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নগেন্দ্রের সে শক্তি, সে ক্ষমতা অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। যে নগেন্দ্র শিষ্টতা ও সৌজন্যে দশের নিকট গণ্য মান্য ছিল, এখন তাহার সে ভাব আর দেখা যায় না। একমাত্র মোহিনী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অহোরাত্রি বিরাজ করিতেছে। নগেন্দ্রের পৈত্রিক ধনসম্পত্তি এরূপ নাই যে, আমোদ আহ্লাদে সে দিন কাটাইতে পারে, তাহাকে সংসার-যাত্রার জন্য ভাবিতে হয়। পরিবারগণের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে তাদৃশ আর না থাকিলেও, আবশ্যকীয় খরচ পত্রাদি রহিত করিলে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইবে না, একারণ অতি কষ্টে তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে।

মোহিনী নগেন্দ্রকে সুমিষ্ট কথায় ও ছলনায় এরূপ বিমোহিত করিয়াছে যে, হতভাগ্য প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার তেজ, গর্ব্ব, অহঙ্কার, বংশমর্য্যাদা, আত্মগৌরব এখন আর কিছুই নাই, সে মোহিনীর হাতে ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াছে। নগেন্দ্রের নিজ ক্ষমতায় কোন কার্য্য করিবার আর অধিকার নাই, কর্ম্মস্থানে না যাইলে অর্থের অভাব হইবে, মোহিনীর মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না, একারণ সে বিষয়ে নগেন্দ্রকে

এক দিনের জন্যও নিবৃত্ত হইতে মায়াবিনী অনুরোধ করে নাই। নগেন্দ্র যদিও বাল্যকালাবধি সময়ে সময়ে আমোদ প্রমোদে মিলিত বটে, কিন্তু বেশ্যার প্রতি অনুরাগ তাহার এক দিনের জন্যও প্রকাশ পায় নাই, এ বিষয়ে তাহার বিশেষ অবজ্ঞা সূচক দৃষ্টি ছিল। সময়-স্রোতে নগেন্দ্রের যেরূপ মনোভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহ জীবনে ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা কদাচ তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

মোহিনীর মাতার সহিত অনেক সম্ভ্রান্ত গণ্য মান্য ভদ্রলোকের আলাপ পরিচয় ছিল—যদিও ভদ্র পল্লীতে তাহার এক্ষণে বসতি বটে, তথাচ কুলটার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। নগেন্দ্র সে বাটীতে যথাক্রমে প্রায় নয় মাস যাতায়াত করিতেছে, মোহিনী অসময়ে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, কোন প্রকারে রমণীর কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া নগেন্দ্র অনুষ্ঠিত পাপকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, ইহজীবনে এরূপ গর্হিত কার্য্যে আর লিপ্ত হইবে না। নরকের কীট হইয়াও নগেন্দ্রের মনে মনে এখনও এইরূপ কল্পনার সঞ্চার হইত, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারে মোহিনী বিশ্বাসঘাতকিনীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে—প্রেমিকের কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে উদ্যোগী হইয়াছে, সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া সবিশেষ বুঝিয়া কোন কার্য্য করিবার এক্ষণে নগেন্দ্রের শক্তির অভাব হইয়াছে।

নগেন্দ্র পূর্ণিমা রাত্রে কিয়ৎক্ষণ সুধাকর-করধারা সেবন মানসে গৃহ হইতে বাহির হইলেও, সর্ব্বাগ্রে মোহিনীর বাটীতে উপস্থিত হইল। বেড়াইতে আসিবার কালে নগেন্দ্র যাহা যাহা মনে কল্পনা করিয়াছিল, প্রেমিকার সাক্ষাতে সে সকলই তাহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব চিন্তা ভুলিল।

মোহিনীর গৃহে একটী আলোকও ছিল না, পালঙ্কে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা সজ্জিত রহিয়াছে, সম্মুখে তলদেশে একখানি মাদুর পাতা রহিয়াছে,

তাহাতে তিন চারিটী মাত্র তকিয়া রক্ষিত আছে। নগেন্দ্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিরাণ ও উড়ানি খানি একখানি ছবির ফ্রেমে রাখিয়া তকিয়া ঠেশ দিয়া শয়ন করিল, পরক্ষণে মোহিনী আসিয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। প্রেমিক প্রেমিকা কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইল, বিমুক্ত দ্বারদেশ দিয়া চন্দ্রকিরণ তাহাদের সে বাক্যালাপ শুনিতে লাগিল। মোহিনীর কথায় কথায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, প্রণয়-তরঙ্গে, নগেন্দ্র আত্মহারা হইলেও, তাহার সম্মুখে এক দিনের জন্য ভালবাসার কোন কথার উল্লেখ করে নাই। উভয়ে মুখোমুখী হইয়া শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে বহির্দ্বারে জনৈক ব্যক্তির সাড়া পাওয়া গেল। মোহিনী উপপতির নিকটে থাকিয়া সে শব্দের প্রতি বিশেষ কর্ণপাত করিল না, নগেন্দ্রনাথ এ সকলের কিছু রহস্য ভেদ করিতে পারিল না, কিন্তু সন্দিগ্ধ হইল। মোহিনীর মা সত্বর পদ বিক্ষেপে নিম্ন দেশে যাইয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল, তৎ সঙ্গে দুই জন আগন্তুকের বাটীর মধ্যে প্রবেশের পদশব্দ নগেন্দ্রের শ্রবণে পশিল। যুবক সেই শব্দ শুনিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "মোহিনি! কে আসিল?"

মো। মা আজ উকিল বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি ও কার্ত্তিক বাবু আসিয়াছেন।

কার্ত্তিক বাবুর সহিত মোহিনীর পূর্ব্ব সম্বন্ধ, কার্ত্তিকচন্দ্র মোহিনীর বাটীতে সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে, এ কথা নগেন্দ্র মোহিনী প্রমুখাৎ ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল, নগেন্দ্র মোহিনীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রতি রাত্রে প্রণয়িনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও সহবাস করিলেও তাহার এখনও সমাজে লজ্জা ভয় যথেষ্ট ছিল। নগেন্দ্র মোহিনীর গৃহে প্রতি রাত্রেই উপস্থিত থাকিয়া সুদীর্ঘ কাল ক্ষেপণ করে বটে, কিন্তু পার্শ্বগৃহ হইতে তাহার মুখের কথাও কেহ শুনিতে পায় না। সময়ে সময়ে সে বাটীতে নগেন্দ্র আহারাদিও করে, তাহাতেও কোন গোলমাল হয় না।

আগন্তুকদ্বয় নগেন্দ্রের বিশেষ পরিচিত, একজন পুলিসের উকীল, অন্যটি সুবিখ্যাত রায় পরিবারের সম্পর্কীয় ব্যক্তি। নগেন্দ্র ভাবিল, আপনি গৃহ মধ্যে রহিয়াছে, বারাণ্ডায় আগন্তুক দুই জনে কথা বার্ত্তা কহিতেছে, যখন তাহাদের দুই জনের গলার আওয়াজ সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, অবশ্যই তাহারাও তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে। বেশ্যা-সহবাসে নগেন্দ্রের মতিগতি কলুষিত হইলেও, বেশ্যালয় পরিচয় দিবার স্থান নহে—এখন কোন সুযোগে মোহিনীর বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেই, সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। অন্যান্য দিন যে সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসে, তদপেক্ষা শনিবার সুদীর্ঘ কাল তাহার মোহিনী সহবাসে কাটিয়া যায়। নগেন্দ্র রাত্রি সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময়ে প্রণয়িনীর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল, কথায় কথায় কিছুক্ষণ অতীত হইতে না হইতে, আগন্তুক দ্বয়ের এরূপ আগমনে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; কিন্তু কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, একমাত্র মোহিনীর উত্তর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে মোহিনী সাদর সম্ভাষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "নগেন বাবু, তোমায় একটী কথা বলিব, যদি রাগ না কর।"

ন। তোমার কথায় আমার আবার রাগ কি? তুমি স্বচ্ছন্দে বল, আমি সাধ্যমত তাহার অন্যথা করিব না।

মো। আজ কি তুমি থিয়েটার দেখিতে যাইবে? আমার ইচ্ছা—তুমি একবার থিয়েটার হইতে বেড়াইয়া এস।

নগেন্দ্র মোহিনীর কয়েকটী কথা শুনিয়া এককালে সংজ্ঞা হারা হইল, যে মোহিনী তাহার সহিত আলাপ পরিচয়াবধি একদিনের জন্যও স্বেচ্ছায় বিদায় দিতে কোন মতে সম্মত হয় নাই, সহসা সেই প্রণয়-পুত্তলি মোহিনী কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যাইবার আকিঞ্চন করিবা-

মাত্র নগেন্দ্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, যুবক বুঝিল—বিষধরীর বিকট হলাহল তাহার আপাদ মস্তকে বিস্তারিত হইয়াছে, এ প্রাণসংহারক গরল রাশি হইতে উদ্ধার লাভের আর শক্তি নাই! পতিব্রতা সাধ্বী সম্মিলনে নগেন্দ্র যে শক্তি সম্পন্ন ছিল, সতীর দেহত্যাগে সে শক্তি হারাইয়া মোহ বশতঃ যে শক্তিকে আশ্রয় দিয়া আপনার ভাবিয়াছিল, সহসা তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া, নগেন্দ্র এককালে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মোহিনী তাহাকে আত্মদান করিয়াছে, মোহিনী তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপনার ভাবিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। মনে মনে নগেন্দ্রের যে স্পর্দ্ধা ছিল, এত দিনে তাহা খর্ব্ব হইল। নগেন্দ্রের মস্তক ঘুরিল, উপায়ান্তর বিহীন যুবক নীরব হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া নগেন্দ্র মোহিনীকে কাতর কণ্ঠে বলিল, "দেখ, থিয়েটার দেখা আমার একটা বাতিক ছিল, শনিবার অন্ততঃ একবার থিয়েটারে না যাইলে, আমার কেমন যেন একটা অভাব বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু তোমাকে পাইয়া আমার সে অভ্যাস ঘুচিয়াছে, যাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে, আমাকে আদর যত্ন ও অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইত, তোমাকে পাইয়া আমি আর তাহাদের নিকট যাতায়াত রাখি নাই, তাহাদের ভুলিয়াছি—এখন তুমি আমায় থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা বলিলে কেন? তুমি বলিয়াছিলে—রাজ-সিংহের অভিনয় দেখিতে যাইবে, আমি যে সময়ে আসিয়াছিলাম, যদি যাইবার হইত—অনায়াসে এতক্ষণে যাওয়া হইত। আমি আসিলে, তুমি তো আর থিয়েটার দেখিবার কথার উচ্চবাচ্য করিলে না, তবে এ কেমন কথা? তুমি যাইতে বলিলে—অবশ্য আমার যাইতে হইবে; আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না—জানি না। আমার ইচ্ছা ছিল—আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিব, আসিবার সময় ছোট খোকা আমাকে সকাল সকাল

যাইবার কথা বলিয়াছিল। এখন আমি যাই, কিন্তু আর আসিব না, এ মুখ আর দেখাইব না।

মো। তুমি যাইয়া যদি আসিতে পারিবে না, আমি তোমায় যাইতে দিব কেন? তুমি এখানেই থাক, বাটীর বাহির হইতে হইবে না।

ন। তুমি যখন যাইতে বলিয়াছ, আমি যাইব। আমার গমনে প্রতিরোধী হইতেছ কেন?

মো। না, আমি তোমায় যাইতে দিব না; ভাল, তুমি আমার কথায় রাগ করিলে কেন? আমি তোমায় ভাল কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আর তুমি আমার কথায় রাগিয়া উঠিলে?

ন। মোহিনি! তোমার কথায় আমার মান অপমান কি? আমি অনেক দিন আত্মমর্য্যাদা তোমার পদে বিসর্জ্জন দিয়াছি; কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমার শরীর ও মন যেন কেমন করিতেছে, আমি না বলিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না,; ভাল, আমি আজ যখন সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাটীতে আসিলাম, তোমার মা ও তুমি আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া আসিলে কেন? কোন একটা কথা উত্থাপন করিয়া, সে সময়ে বিদায় দিলে তো আমার প্রাণে এ ব্যথা লাগিত না।

মো। দেখ, তুমি অনর্থক মনে এরূপ ভাব লইতেছ, আমি তোমাকে মন্দ অভিপ্রায়ে কোন কথা বলি নাই—কখন বলিবও না—তুমি ক্রোধবশে এরূপ ভাবের পরিচয় দিতেছ। সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! আমি একদিনের জন্যও তোমার সহিত ছলনা করি নাই—এখনও করিতেছি না, ভবিষ্যতে—করিবও না। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তোমার সমক্ষে আমার নিজের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি—আমার মনে অন্য কোন কুভাব নাই। তোমার সহিত আলাপ হইয়া আমি তোমাকেই আপনার

ভাবিয়াছি, এক দিনের জন্য সে ভাবের রূপান্তর দেখাই নাই—তুমি আজ আমায় অবিশ্বাস করিলে? আমার অদৃষ্টে ভগবান বুঝি সুখ লেখেন নাই! আমি তোমায় লইয়া সুখী হইয়াছিলাম, আজ তুমি আমায় সে সুখে বঞ্চিত করিলে।

ন। মোহিনি! তুমি যাহা বলিয়াছ, যদি ঠিক তাহা বুঝিয়া দেখ, দোষী নির্দ্দোষী অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, আমি তোমায় অন্যায় একটী কথাও বলি নাই, তোমাকে কোন কথা বলিবার আমার সাধ্য বা অধিকার কি আছে? স্থির হইয়া যদি ঠিক ভাবিয়া দেখ—তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, আমার আমিত্ব তোমার কাছে বিক্রয় করিয়াছি। আমার মুখ হইতে যদি কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, জানিও সে তোমার শক্তি। আমি তোমাকে শক্তিরূপে সহায় পাইয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, ভালমন্দ বিচারাচার আমার যাহা কিছু—এখন সমস্তই তোমার উপরে। তোমাকে, আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে এই মাত্র বলিয়াছি যে, আর আমি তোমাকে এ মুখ দেখাইব না, তোমার ওমুখ দেখিব না—কথায় কথায় এ কথা আমি বলিয়াছি বটে, কিন্তু মোহিনি! তোমার কথায় আমার প্রাণে যে কি ভীষণ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আমিই জানি—সে কথার মর্ম্ম তুমি কি বুঝিতে পারিবে? ভাল, যদি আমার কথায় তোমার রাগ হইয়া থাকে, আমায় ক্ষমা কর, আর তোমায় ওরূপ ব্যথায় ব্যথিত করিব না।

মো। তোমার কথায় আমার আবার রাগ কি? তুমি আমার কে, যে, তোমার কথায় আমি রাগ করিব? আর তোমার উপর আমার রাগইবা সাজিবে কেন? পর কি কখনও আপনার হয়? ভাল, নগেন! একটা কথা বলিয়া রাখি—তুমি যখন আমার এ মুখ দেখিবে না বলিয়াছ, আর তোমাকে এ মুখ দেখাইব না। আমার

পৃথিবীর কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, তোমার সম্মুখেই আমি মরিব। নগেন্দ্র! যদি তোমায় আমি এক মনে এক প্রাণে ভাল বাসিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে আমার জন্য কাঁদিতে হইবে, আমি তোমার সহিত ছলনা চাতুরী কিছুই করি নাই, ঈশ্বর সাক্ষী—আমি গুরু দিব্য করিয়া বলিতেছি, নগেন! আজ রাত্রি প্রভাতে আর তোমার সহিত দেখা হইবে না। আমি কষ্টে দিন কাটাইয়াও তোমাকে লইয়া সুখী হইয়াছিলাম, আজ তুমি সে বন্ধন ছিঁড়িয়া দিলে, ভাল—নিষ্ঠুর! যাও, তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি মস্তক পাতিয়া তাহাই করিব, কখন তাহার অন্যথা হইবে না; কিন্তু সে সাধ আর কতক্ষণের জন্য—আমার সকল আমোদ আহ্লাদ ফুরাইয়াছে, তুমি আমায় পাগল করিয়াছিলে, তাহাতেও আমি সুখী ছিলাম। আজ তুমি নারী হত্যার পাতকী হইলে। নগেন্দ্র! তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে আজ আমি আত্মঘাতী হইব। ভাল, যাহা করিয়াছ কর—তুমি সুখী হও, তবে একটী কথা বলিয়া রাখি, আমার অন্তিম সময়ে একবার উপস্থিত থাকিও, সে সময়ে মোহিনী আর তোমাকে ব্যথিত করিবে না, মোহিনীর মৃত্যু-ব্যথা দেখিয়া মোহিনীর নয়নাসারে এক বিন্দু অশ্রু মিশাইও! তোমাকে আর আমার কোন কথা বলিবার নাই—এখন তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার; তুমি যাইতে চাহিয়া ছিলে—স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, আর আমি তোমায় কোন বাধা দিব না। আমি ছলস্বরূপেও কখন তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই; যদি অজ্ঞাতসারে কিছু করিয়া থাকি, তুমি আমার পূজ্য, অবলা জ্ঞানে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

মোহিনীর ভাব গতি দেখিয়া নগেন্দ্রের সরল হৃদয়ে ব্যথা লাগিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটী কথা বাহির হইল না। প্রকৃত পক্ষে মোহিনীই নগেন্দ্রের হৃদয়ে শক্তিশেল হানিয়াছে, সেই যন্ত্রনায় তাহার

ধৈর্য্য চ্যুত হইয়াছে, মোহের বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শক্তি নগেন্দ্র-হৃদয়ে লোপ পাইলেও অভাগা মোহিনীর মর্ম্মান্তিক কাহিনী ভুলিতে পারিতেছে না, প্রণয়িনীর বিকৃত ভাব লক্ষ করিয়া নগেন্দ্র বিশেষ চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইল। গৃহ মধ্যে নগেন্দ্র ও মোহিনী ব্যতীত আর কেহ নাই, অকস্মাৎ সেখানে কোন এক বীভৎস কাণ্ড ঘটিলে, সকল বিষয়েই নগেন্দ্রকে অপরাধী হইতে হইবে। এখনও বাহিরে আগন্তুক দ্বয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, মোহিনীর মাতাও তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। সহসা মোহিনী যদি এক কাণ্ড করিয়া বসে, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে নগেন্দ্র অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন অপরাধ না থাকিলেও তাহাকে দোষী হইতে হইবে। ছলনা-ময়ী মোহিনীর দারুণ কথা শুনিয়া নগেন্দ্র বিষম ভাবনায় এক কালে স্তম্ভিত হইল। মোহিনীর আবশ্যক মত খরচ পত্র নগেন্দ্র যোগাইতেছে, বিশেষ মান মর্য্যাদার সহিত প্রণয়িনীর নিকট কাটাইয়া আসিতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও উভয়ে উভয়ের প্রতি বিরূপ ভাব দেখায় নাই—দেখেও নাই—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত স্বরূপ মোহিনীর মুখ হইতে কেন এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল, ক্রোধ বশে নগেন্দ্রই বা কি জন্য ইহ জীবনে আর তাহার মুখ দেখিবে না বলিল? যুবক মনে মনে এই সকল চিন্তার আন্দোলন করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে মায়াবিনী মোহিনী আত্ম-ঘাতিনী হইবে বলিয়া নগেন্দ্রকে যে ভয় দেখাইয়া ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা সেই চিন্তাই তাহাকে উত্তরোত্তর ব্যথিত করিতে লাগিল।* নগেন্দ্র অনিচ্ছা সত্বেও নানাবিধ অনুনয় বিনয় বাক্যে মোহিনীর সান্ত্বনা জন্য চেষ্টা করিল। সাধ্য সাধনায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথের আদর সোহাগের কোন অংশেই ত্রুটি হইল না, উপায়ান্তর বিহীন নগেন্দ্র সস্নেহে মোহিনীর মুখ-চুম্বন করিল।

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধে মোহিনী প্রকৃতিস্থ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রের সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। সে রাত্রি সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময়ে নগেন্দ্র গৃহে ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সারা রাত্রি নগেন্দ্রের নিদ্রা হইল না, নগেন্দ্র অনিমিষ নেত্রে মোহিনী-মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন কালে, একমাত্র মোহিনী-চিন্তা নগেন্দ্রের হৃদয়-ক্ষেত্রে বিরাজিত হইয়া প্রাতঃক্রিয়া কলাপ সমস্তই পণ্ড করিয়া দিল। নগেন্দ্র অনন্য মনে মোহিনীর চিন্তাই ভাবিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ করিল না, মনের আগুন তাহার মনেই জ্বলিতে লাগিল।

মোহিনী যখন আত্মঘাতিনী হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথ সজোরে স্বীয় ললাট দেশে মুষ্টাঘাত করিয়াছিল, সে স্থান হইতে যদিও রক্ত পাত হয় নাই বটে, কিন্তু আঘাত চিহ্ন লুপ্ত হইবার নহে—সুস্পষ্ট রূপে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। দারুণ অভিমানে নিজ ললাট দেশে নগেন্দ্র যখন আঘাত করিয়াছিল, সে সময়ে মোহিনী বলিয়াছিল, "নগেন! এ আঘাত আমার বক্ষে করা হইয়াছে, ইহাতে আমায় বড় ব্যথা লাগিয়াছে, আমার বুকে আচ্ছা ব্যথা দিলে, এই বেদনাই আমার শেষ।" নির্জ্জনে বসিয়া নগেন্দ্র একাগ্রচিত্তে মোহিনীর এই কয়েকটী কথা ভাবিতে লাগিল।

নগেন্দ্রের বন্ধু বান্ধবগণ অনেকেই মোহিনীর প্রতি তাহার একান্ত আসক্তি ও অনুরাগ দেখিয়া একে একে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, কেহ

তাহার সহিত আর মিশিত না, প্রকৃত পক্ষে নগেন্দ্র থিয়েটারে যাওয়া বা বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদ করা, একমাত্র মোহিনীকে পাইয়া সমস্তই বিস্মৃতি-সলিলে ভাসাইয়াছিল, আজ তাহার সেই সকল কথা স্মৃতিপথে একে একে উদিত হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নগেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজ মোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, থিয়েটার দেখিতে যাইয়া চিত্তবিকারের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবে; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিল—না, সন্ধ্যার সময়ে একবার যাইয়া মোহিনীর সহিত দেখা করিয়া আসিবে। গত রাত্রের ঘটনাবলি আর একবার সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিবে; যদিও নগেন্দ্রের মোহিনীর প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তথাচ মায়াবিনীর কুহক-জালে অভাগা এতই আবদ্ধ রহিয়াছে যে, সে মায়াবন্ধন ছেদ করিয়া উঠিতে তাহার শক্তি কুলাইতেছে না। নগেন্দ্র সন্ধ্যাকালে শশব্যস্তে মোহিনীর বাটীতে উপস্থিত হইল। অন্য দিন মোহিনী তাহার সহিত যে ভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া থাকে, আজ যেন আর সে ভাব নাই! নগেন্দ্রনাথ তখনও মোহিনীকে সান্ত্বনা করিতে কোন অংশে ত্রুটি করিল না। বহুক্ষণ পরে ছলনাময়ী মোহিনী গতরাত্রের ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া নগেন্দ্রকে সুমধুর ভৎসনা করিতে লাগিল, "দেখ—তোমার এত তেজ, এত দম্ভ—মানুষ বড় হইতে ইচ্ছা করিলে, আপনাকে ছোট জ্ঞান করে। নগেন! তুমি রাগের বশবর্ত্তী হইয়া কাল রাত্রে কি করিয়াছ, ভাবিয়া দেখ দেখি—সমাজে তোমার মান সম্ভ্রম আছে, লোকে তোমার প্রশংসা করে, বিদ্যা বুদ্ধি বলে মাসে মাসে পরের টাকা ঘরে আনিতেছ; কিন্তু তোমার এ কি প্রকৃতি? তোমার এক মূর্ত্তি শীতল জল, অন্য মূর্ত্তি দীপ্ত অগ্নি শিখা, তোমার সহিত কথা কহিয়া প্রাণ শীতল হয়, অন্য রূপে তোমাকে দেখিলে—শরীর শিহরিয়া উঠে। তোমায় আমি মান্য করি, ভক্তি করি, তুমি আমার পূজ্য, দশের পূজ্য; যে ভাবে তুমি কাল দেখা দিয়া ছিলে, সে ভাব লোকে

দেখাইলে—তোমার সে মান, সে সন্ত্রম কোথায় থাকিবে? এই কি তোমার লেখাপড়ার শিক্ষার ফল? যত দিন যাইতেছে বয়স বাড়িতেছে, ভাল—তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার উপর রাগ প্রকাশ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাকে কি রাগিতে দেখিয়াছ? আমার জীবনে কখন কেহ আমাকে এক দিনের জন্য একটা চড়া কথা কহিতে পারে নাই, তোমার জন্য আমি তাহাও সহিলাম; ভাল, তোমার সুখেই আমার সুখ, তুমি আমাকে অপমান করিয়া যদি সুখী হইয়া থাক, আমি তোমার তিরস্কার আদর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, এক দিন না এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে—আমি তোমায় সুখী রাখিতে যত্ন পাইয়াছিলাম কি না।

ন। প্রিয়তমে! আমি তোমায় এত অনুনয় বিনয় করিলাম, পায়ে ধরিলাম, তথাচ তোমার আমার প্রতি অভিমানের হ্রাস হইল না? এই কি তোমার বালবাসা! আমি তোমায় মাথার দিব্য দিতেছি, গত রাত্রের সকল কথা ভুলিয়া যাও। আর আমি ওসকল কথা তুলিয়া তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিব না, তুমিও আর ওকথা মুখে আনিও না—আমার অপরাধ—আমি নিজেই স্বীকার করিয়া লইতেছি, আমাকে ক্ষমা কর। একবার মুখ তুলিয়া কথা কও।

মো। নগেন! তোমার কথায় বা কার্য্যে কোন প্রকার দ্বিধা আমার নাই বা বাধা দিতেও আমি ইচ্ছুক নহি, তবে তোমার কথামত তোমাকে ওসকল কথা লইয়া আর বিরক্ত করিব না।

মোহিনী ও নগেন্দ্র এইরূপ কথাবার্ত্তায় কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া উভয়ে একত্র মিলনে ক্ষণকাল কাটাইল। নগেন্দ্রের সরল স্বভাব, এ বিষয়ে ভাল মন্দ কিছুই ভাবিয়া দেখিল না, প্রতিদিন যেরূপ ভাবে আমোদ প্রমোদ করিয়া বাটী চলিয়া আসে, আজিও সেই ভাবে বাটী ফিরিয়া

আসিল। গত রাত্রে তাহার আদৌ নিদ্রা হয় নাই, পর্য্যায়ক্রমে মোহিনী সংক্রান্ত ঘটনাবলি তাহার চক্ষু সমীপে একে একে বিকাশ ও বিলীন হইয়াছিল। যুবক হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তে শান্তিময়ী নিদ্রার অপেক্ষায় শয্যা গ্রহণ করিল, সঙ্গের সাথী চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়ে আধিপত্য বিরাজ করিতে লাগিল। নগেন্দ্র চিন্তা-সাগরে ভাসিল, "মোহিনী কি আমায় ভাল বাসে? না, সকলই মায়ার বিকাশ।" পরক্ষণে ভাবিল, "যদি প্রকৃত ভালবাসায় আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে কদাচ কি আমায় ত্যাগ করিতে চায়, নয়নের অন্তরাল করিতে পারে?" মনে মনে আবার প্রশ্ন হইল, "কই মোহিনী তো আমায় একদিনের জন্য বিদায় দেয় নাই, আমি বরঞ্চ সকাল সকাল আসিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ করিয়াছি, তথাচ সে আমায় কত মিনতি জানাইয়া অপেক্ষা করাইয়াছে। তবে আমি তাহাকে অকারণ অপরাধিনী করিতেছি কেন? এ বিষয়ে আমি তাহাকে মুক্ত কণ্ঠে নির্দ্দোষী বলিতে পারি।"

কিছুক্ষণ পরে নগেন্দ্র পুনরায় আপন মনে প্রশ্ন করিল, "তবে শনিবার মোহিনীর কথায় তুমি এককালে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিলে কেন? সে তো তোমাকে বেশ বুঝাইয়া বিদায়ের কথা বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে দুষ্য ভাব লইলে কেন?" আবার ভাবিল—

"সে আমাকে বিদায় করিবার ছলে ওকথা বলে নাই। আমার অনুমান হয়, তাহার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল, কিন্তু আমি নিজের দোষেই সব নষ্ট করিয়াছি, তাহার মনের কথা মনেই রহিয়া গিয়াছে, সে প্রকৃত আমাকে বিদায় দিতে চাহিয়া ছিল কি না, তাহা তো বুঝিয়া লইবার, আমার সুবিধা বা অবসর হইল না, আমার ভাব দেখিয়া সে মন ভাব আর তো ব্যক্ত করিল না, আমি পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট হইতে উঠিয়া আসিতে চেষ্টিত হইলেও, সে আমাকে ছাড়িতে চায় নাই, এরূপ অবস্থায় তাহাকে

আমি কিরূপে অপরাধী করিতে পারি? না, আমার এ মনের ভ্রান্তি, এখনও আমি মোহিনী-চরিত্রে কোন দোষ পাইতেছি না।" আবার ভাবিল—

"দোষ হউক বা না হউক, তুমিতো তাহার প্রতি রাগিয়া উঠিয়াছিলে?" তখন আপনা আপনি প্রশ্ন উত্তরে ভাবিতে লাগিল।

"সে কথা অবশ্য আমাকে স্বীকার পাইতে হইবে।"

"অকারণ একজন অন্য জনের প্রতি ক্রোধ করিতে পারে?"

"না, কারণ ব্যতীত লোকে, লোকের প্রতি রাগান্বিত বা বিরক্ত হয় না, এরূপ ব্যাপারে অবশ্য কোন না কোন কারণ থাকে, কিন্তু আমি বিশেষ তত্ত্ব করিয়াও মোহিনীর কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না।"

যে নগেন্দ্র এক সময়ে বারাঙ্গনার যাচিত প্রেম উপেক্ষা করিত, রমণীর চাতুরীময় কটাক্ষে অবজ্ঞা করিত, এখন আর তাহার সে ভাব নাই। নগেন্দ্র এখন বেশ্যার দাস। সে বেশ্যার প্রতি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, মোহিনী তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বিদায় হইয়া যাইতে বলিলেও, তাহার তজ্জনিত হৃদয়-ব্যথা পর দণ্ডে লুপ্ত হইয়া যায়। নগেন্দ্র গত ঘটনাবলী ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাগত হইল, অনতি বিলম্বে নিদ্রা দেবীর অন্তর্ধ্যানে সে জাগিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই মোহিনীর, মোহিনী মূর্ত্তি নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মোহিনীর কথা লইয়াই এক্ষণে নগেন্দ্রের তোলা-পাড়া, বিষয় কার্য্যে যুবকের আর তাদৃশ অনুরাগ রহিল না।

পর দিবস সন্ধ্যার পরক্ষণেই নগেন্দ্র মোহিনীর বাটীতে উপস্থিত হইল, মোহিনী আজ তাহাকে আদর যত্ন প্রদর্শনে কোন অংশেই ত্রুটি করিল না, নগেন্দ্র মোহিনীর মায়ায় এত মুগ্ধ যে, সে সব ভুলিয়া গেল, প্রণয়িনীকে সস্নেহে হৃদয়ে ধারণ করিল। পরস্পরের সামান্য কথা-সংঘাতে যে মনো-মালিন্য জন্মিয়াছিল, সরল প্রকৃতি নগেন্দ্রের হৃদয় হইতে তাহা ইতিপূর্ব্বেই

বিদূরীত হইয়াছিল; এক্ষণে সোহাগে সোহাগিনীকে যুবক বক্ষে ধরিল, মোহিনীও তাহাকে ভালবাসা জানাইতে কোন অংশে ক্রটি দেখাইল না। রাত্রি সাৰ্দ্ধ দশঘটিকার সময়ে নগেন্দ্র মোহিনীর নিকট, গত দুই রাত্রি আদৌ নিদ্রা হয় নাই জানাইয়া বিদায় লইল। মোহিনী অদ্য নগেন্দ্রে সেরূপ আসক্ত ছিল না।

আসিবার সময়ে নগেন্দ্র, পর দিবস স্থানান্তরে যাইতে হইবে, একারণ আসিতে পারিবে না—জানাইল। মোহিনী পূর্ব্বে এরূপ কথায় যেরূপ মিনতি ভাব প্রকাশ করিত, অদ্য সে আগ্রহ কিছুই দেখাইল না। নগেন্দ্র বিদায় লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে মোহিনী তাহাকে সামান্য দুই একটী খাদ্য সামগ্রীর অভাব জানাইল, নগেন্দ্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সন্নিকটস্থ দোকান হইতে রমণীর প্রার্থনা মত সামগ্রী গুলি আনিয়া দিয়া বাটী যাইল। সহজেমুগ্ধ নগেন্দ্রের মনে কোন প্রকার মলিনত্ব রহিল না, গত রাত্রের অপেক্ষা অদ্য হৃদয়-যন্ত্রনা অনেক দূর হইয়া আসিয়াছিল, বাটী আসিয়া নগেন্দ্র নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

পর দিবস সন্ধ্যাকালে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় মোহিনীর সহিত দেখা সাক্ষাতের জন্য নগেন্দ্র কথঞ্চিৎ অধীর হইয়াছিল, কিন্তু সে দিবস তাহাদের বাটীতে যাইবে না বলিয়া আসিয়াছে, এজন্য বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকিয়া মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিল। রজনী যতই বাড়িতে লাগিল, নগেন্দ্র, মোহিনীর জন্য ততই উদ্বিগ্ন হইল। তুচ্ছ বেশ্যাপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া নগেন্দ্র অধঃপাতে গিয়াছে, এ চিন্তা এক বার তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে মেঘ মুক্ত চপলার ন্যায় তাহা নিমেষের জন্য বিকাশ পাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়া গেল। দুঃখে কষ্টে রজনী পোহাইল। প্রভাত হইতেই মোহিনীর জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইল। নগেন্দ্র স্থির বুঝিল যে, মোহিনী তাহার হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে, এখন সে মনে করিলে তাহাকে ক্রীড়ার পুত্তলির

ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, অগত্যা সে তাহার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে।

গত শনিবার রাত্রে নগেন্দ্র মৌখিক যে তেজ দর্প দেখাইয়াছিল, যাহাতে প্রণয়িনীর প্রাণে ব্যথা দিয়াছিল, আজ সে বুঝিল যে, সে তেজ তেজ নহে, সে শক্তি—সে অনেক দিন হারাইয়াছে, এখন তাহার আশা ভরসা —অধিক কি, জীবন পর্য্যন্ত মোহিনীর হাতে! এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকালের জন্য নগেন্দ্র নিষ্পন্দ ভাব ধারণ করিল। কুলটার প্রেমে মজিয়া যে নগেন্দ্র, এক দিনের জন্য পরিণাম বা পরকালের কথা আদৌ ভাবে নাই, সহসা তাহার মনে সেই চিন্তা উদয় হইল। সে চিন্তায় যুবক অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিল। কেন, কি জন্য এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, নগেন্দ্র মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে লাগিল। চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া নগেন্দ্র বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিমগ্ন হইল, যতই ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাহার মস্তিষ্ক অধিকতর ঘূর্ণীত ও বিকৃত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র অবসন্ন ও জ্ঞানহারা হইয়া নিস্তব্ধ ও স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিল। বন্ধু বান্ধবের নিকট মোহিনীর কথা লইয়া আন্দোলন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র পুনঃ পুনঃ হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, এক্ষণে কাহাকেও কোন কথা ব্যক্ত করিতে না ইচ্ছা থাকায় মনের দুঃখ মনে চাপিয়া অধিকতর যন্ত্রনা ভোগ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রজনী গভীরা, অর্দ্ধ জগৎ সুষুপ্তা, লোককোলাহল লোকালয় হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, সাড়া শব্দ কিছুই নাই। মেদিনীরাণী নীরব নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে পেচক শৃগাল প্রভৃতি নিশাচরগণের বিকট শব্দে শান্তিময়ী প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ হইতেছে, পরক্ষণে আবার সতী সে মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। অকস্মাৎ হতভাগ্য নগেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, শয্যায় অপগণ্ড পুত্র দুইটী গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, নগেন্দ্র একবার উন্মুক্ত জানালার ফাঁকে গৃহপ্রবিষ্ট চন্দ্রকিরণে সুকুমারদ্বয়ের মুখের প্রতি তাকাইল, পরক্ষণে সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত আপনার অবস্থা ভাবিল, "কি ছিলাম, কি হইলাম, যে কেন্দ্রের উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে উপেক্ষা করিয়া, এতদিন অনুরাগ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, একমাত্র তাহাকে হারাইয়াই আমার সে আশা ভরসা সকলই গিয়াছে, তাহার অভাবে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও আমি কৃতীমান হইতে পারিতেছি না, উত্তরোত্তর নীরাশ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি, ইহ জীবনে এ ভাবের কি আর পরিবর্ত্তন ঘটিবে না! যাহার অবলম্বনে আমার সংসারধর্ম্ম, সে যদি আমার মুখের প্রতি না তাকাইয়া ইহলোকে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গেল, তবে আমি কোন শক্তি প্রভাবে কাহাকে আশ্রয় ধরিয়া এ মায়াপুরীতে বাস করিব? সে ব্যতীত আমার মুখের প্রতি তাকাইয়া সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে আর আমার কেহতো নাই! অবলম্বন শূন্য জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমি যাহাকে আত্ম সমর্পণে "আমার" করিয়া লইয়াছিলাম, যে আমাকে জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়াও পরিতৃপ্তা হয় নাই—যখন তাহাকে হারাইয়াছি, তখন এ প্রাণ-শূন্য দেহ ধারণে প্রয়োজন কি?"

ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্রনাথের চিন্তাস্রোত ফিরিল। যুবক মনে মনে আন্দোলন করিল, "সে আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আমিতো তাহাকে ত্যাগ করি নাই, তবে আমি অবলম্বন শূন্য কেন? তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই সেতো আমার স্মৃতিপথে বিকাশ পাইতেছে, তবে আমি কাল্পনিক অভাবে এরূপ আত্মহারা হইতেছি কেন? হইতেছি বলিয়াইতো সংসারের প্রতি বীতভৃষ্ণা জন্মিতেছে। সে নাই, কিন্তু আর সকলেইতো রহিয়াছে, তবে আমি উদ্যমহীন হইয়া জড়ের ভাব গ্রহণ করিতেছি কেন? যাহার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার সে কার্য্য কি সমাধা হইয়াছে? কই—না, তাহার তো কিছুই করি নাই! আমি অকর্ম্মণ্য ভাবে দিন কাটাইয়াছি, আত্মাবলম্বন ব্যতীত আমার কার্য্যতো হইবার নহে। আমি সে বিষয়ে তো এক দিনের জন্য দৃষ্টিপাত করি নাই, অথচ হাহা ধাধা করিয়া বেড়াইয়াছি। তবে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার উপায় কি? যাহাদের লালন পালন ভার আমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, যাহারা আমার অবলম্বনে নির্ভর করিতেছে, আমি ব্যতীত যাহাদের অন্য গতি আর নাই, আমি ভিন্ন যাহারা আর কাহাকেও জানে না—তাহাদের মুখ তাকাইয়াও আমার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতেছে না কেন? প্রকৃত পক্ষে আমি আত্মবঞ্চনা জনিত মহাপাতকে দিনে দিনে লিপ্ত হইতেছি, এ ঘোর পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় অনুসন্ধান আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকা—সেতো কাপুরুষের লক্ষণ। আমি পদে পদে অন্যের মুখাপেক্ষি হইতেছি, তবে আমার আমিত্ব কোথায়? ছি! ছি! মানুষের প্রকৃতি কি দুর্ব্বল, সে একের অভাবে জগৎ সংসারের অভাব দেখে! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার জন্য আর শোক করিব না, সে আমার এক সময়ে আদরের বস্তু ছিল, এখন সে নাই, কিন্তু তাহার দিব্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে স্তরে

স্তরে প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় অহোরাত্র বিরাজ করিতেছে, ইহ-জীবনে তাহাকে ভুলিব না—ইহাও ঠিক জানিতেছি, কিন্তু তাহার উদ্দেশে আর আত্মহারা হইব না, আমার আদরের ধন আমারই আছে; সে আমার আদরের ধন, পুত্র কন্যা তাহার আদরের ধন, যাহারা তাহার আদরের ধন, আদরের আদরের ধন বলিয়া—তাহারাও আমার আদরের ধন। এখন আমি তাহাকে আরাধ্য জ্ঞান করিব; তাহার জন্য তাহার আদরের সংসার ধর্ম্ম আর জলাঞ্জলি দিব না, তাহাকে হারাইয়া আমি সকল হারাইতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার আদরের ধনতো আমার ত্যাগের বস্তু নহে, তবে, তাহার অভাব ভাবিয়া সকলের অভাবের কারণ হইব কেন?"

নগেন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সুখময়ী নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবনা চিন্তার কঠোর যন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু তাহাকে সে শান্তি অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না, সহসা স্বপ্ন দেখিয়া বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়চ্যুত হইল। নগেন্দ্রনাথ স্বপ্নাবস্থায় দেখিল, যেন সহধর্ম্মিণী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, তাহার প্রতি উদ্দেশে বলিতেছেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার একি ভালবাসা—আমায় লইয়া সংসারী হইয়াছিলে, আমার স্থূল মূর্ত্তি অভাবে সে বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যোগী হইতেছ কেন? আমি তোমায় সূক্ষ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, তুমি আমায় সূক্ষ্মে তাহার প্রতি-দান দিয়াছিলে, তাই উভয়ে ভিন্ন শরীর হইলেও সূক্ষ্মে এক হইয়া ছিলাম। আমার স্থূল অবিদ্যমানে তোমার অভাব বোধ, এ তোমার লঘু প্রকৃতির পরিচয়। সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে যখন একবার মিশিয়াছিল, তখন স্থূলের অবর্ত্তমানে সে মিলনে ব্যাঘাত হইবে কেন? আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। কার্য্য-ক্ষেত্র তোমার সম্মুখে প্রশস্ত রহিয়াছে, সেই পথে অগ্রসর

হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন কর, পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে অযত্ন করিলে, তোমাকেই মনোকষ্টে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

নগেন্দ্রনাথের তখনও সংজ্ঞালাভ হয় নাই। বহুদিনের পর স্বপ্নে প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইয়া নগেন্দ্র সোৎসাহে উত্তর করিল, "প্রিয়তমে! তুমি আমায় অবলম্বন শূন্য করিয়াছ, তোমায় হারাইয়া আমি শক্তিশূন্য হইয়াছি, এ নির্জীব জীবনে কোন কার্য্য করিবার আর আমার সাধ্য নাই। এখন আমার পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল, আমার জীবন ধারণে আর আবশ্যক কি?" ছায়াময়ী বলিল, "ছি! ছি! অমন কথা মুখে আনিও না, তোমার মরণে আমার মরণ, আমি দেহত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু দিবারাত্রি তোমার সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছি, তোমার প্রতিকার্য্যে আমার দৃষ্টি রহিয়াছে, তবে তুমি আমায় নিরানন্দ করিতে চাহিতেছ কেন? তোমায়তো এইমাত্র বলিলাম যে, আমি তোমার প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছি, তবে আমায় অন্তরালে রাখিতে চাহ কেন? আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী, সহধর্ম্মিণী—তাই তোমার হৃদয়রাজ্যে অধিকার পাইয়াছি, এখন তুমি তোমায় পৃথক্ করিতে চাহিলে, আমার স্থান কোথায়?" নগেন্দ্র বলিল—

"প্রিয়তমে! এস—নিকটে এস, আর তোমায় আমার ব্যবধানে রাখিব না, একবার দেখ—তোমার অবর্ত্তমানে আমার হৃদয় জলশূন্য মরুভূমি প্রায় হইয়াছে, এ তাপিত হৃদয়ে একবার শান্তিবারি বর্ষণ কর, আবার আমি নব উৎসাহে নবীন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। আমার এ সাধ পূর্ণ কর, বহুদিন তোমায় আমায় দেখা সাক্ষাৎ নাই, তুমি সাধ্বী সতী পতিব্রতা, অন্তরালে থাকিয়া অভাগা নগেন্দ্রের আর দুঃখের কারণ হইও না, একবার নিকটে এস! আর আমায় বিরহানলে দগ্ধ বিদগ্ধ করিও না। তোমায় হারাইয়া আমার কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, আমার দিব্য—আমার এ অনুরোধ রক্ষা কর, আর আমি

তোমায় কখনও অসুখী করিব না। তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ রহিয়াছে, প্রসন্ন বদনে একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখ, আমার সকল দুঃখ কষ্টের অবশান হউক। শান্তিময়ি! আমি শান্তির জন্য তোমায় আকিঞ্চন করিতেছি, আমার কথা রাখ, একবার নিকটে এস।”

ছায়াময়ী, নগেন্দ্রনাথের জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিয়া উত্তর করিল, “স্বামিন্! আমি এখন অশরিরী, তোমায় আমায় এই ভাবেই দেখা সাক্ষাৎ হইবে, আমি সূক্ষ্ম শরীরে তোমায় দেখিয়া আমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু এ জীবনে তুমি আর আমায় পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবে না। আমার, তোমার চরণে এই মাত্র ভিক্ষা যে, তুমি সংসার ধর্ম্মে উপেক্ষা করিও না, যতদিন সংসারে থাকিতে হয়—উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্য কর। আমার সময় নাই—এখন দাসী শ্রীচরণে নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেছে।”

নগেন্দ্রনাথ অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় প্রণয়িনীর সকল কথা শুনিল বটে, কিন্তু নয়ন উন্মীলনে আর তাহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। হা হুতাশে নগেন্দ্রনাথের সময় কাটিল, বহু দিনের পর সহধর্ম্মিণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহার দর্শন লাভ ঘটিল না। প্রণয়িনীর কথা যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল, শত সহস্র ধারায় নগেন্দ্রের নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া, তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া উপাধান সিক্ত করিল। নগেন্দ্রনাথ শয্যায় উঠিয়া বসিল, তখনও ত্রিযামার অবশান হয় নাই, নিবিড় অন্ধকারে পুনরায় শয়নে নগেন্দ্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, “হা অদৃষ্ট! দেখা পাইয়াও দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে এত ডাকিলাম, এত সাধিলাম, এত অনুরোধ করিলাম, সে আমার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিল না, আমার তন্দ্রাবস্থায় কত কথা কহিল, পদে পদে বলিল

যে, সে আমার জীবনসঙ্গিনী, তবে সে আমার আকিঞ্চন অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল কেন? হায়! সে অশরিরী হইয়া আমার সকল কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে, আমি যাহা যখন করিতেছি, জানিতে পারিতেছে, কিন্তু আমি তাহার কি করিতেছি? সে আমায় পুনঃ পুনঃ সংসারধর্ম্মের প্রতি মতিগতি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল, তবে আমার বর্ত্তমান অবস্থা তো তাহার কিছুই অবিদিত নাই! ধিক্ আমার জীবনে! আমি প্রাণপ্রতিমা প্রণয়িনীকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহারা হইতে বসিয়াছি। আমি ভাবিতে ছিলাম, সংসারে আমার মুখের প্রতি চাহিতে, আমাকে আমার ভাবিয়া স্নেহ যত্ন করিতে, আমার সুখ দুঃখের সমভাগী হইতে—কেহ নাই, এখন দেখিতেছি তাহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। সে স্বেচ্ছায় এখনও আমার অবলম্বন স্বরূপিণী রহিয়াছে, তবে আমি জড়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত ভাবে দিনযাপন করিয়া, আমার পোষ্যবর্গের অভাব উৎপাদন করি কেন? কষ্টে পুত্র কন্যাদের মনে যদি ব্যথা লাগে, তবে সে ব্যথায় ব্যথিতা তাহাকেওতো হইতে হইবে! আমি তাহার প্রীতির জন্য—পরিজন বর্গের সুখ বিধানে আজ হইতে ব্রতী হইলাম, যত দিন দেহের পতন না হয়, সংসার ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে আর ক্ষণকালের জন্য উপেক্ষা করিব না, আমার ধর্ম্ম আমার রাখাই উচিত।"

নিশার অবশান কালে নগেন্দ্রনাথ এইরূপ আত্মবিলাপে হৃদয় উদ্বেগিত করিতেছে, এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ চন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুত্র পিতাকে শয্যায় চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তুমি অমন করিয়া বিলাপ করিতেছ কেন? রাত্রে কি তোমার নিদ্রা হয় নাই! একে তোমার শরীর অসুস্থ, তাহাতে এরূপ ভাবনা চিন্তায় তোমার অসুখের বৃদ্ধি হইতে পারে। আমার অনেক ক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু তুমি যে বিছানায় শুইয়া এরূপ রোদন করিতেছিলে, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

ন। না বাবা! আমি এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলাম, সহসা স্বপ্ন দেখিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, আমার কোন অসুখ হয় নাই, তোমাদের সুখেই আমার সুখ; ঈশ্বর করুন তোমরা কয়েকটী ভাই ভগ্নীতে বাঁচিয়া থাক, দীর্ঘ জীবন লাভ কর, দশের নিকট গণ্য মান্য হও, সেই আমার সুখ।

শ্রীশ। বাবা! মা'র মৃত্যু হইতেই তুমি অসুখ ভোগ করিতেছ, সেই দিন হইতেই তোমার ভাল রূপ নিদ্রা হয় না, আমার যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তোমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাই। মা আমাদিগকে অনাথ করিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন তুমিই আমাদের আশা ভরসা। তোমার শরীর অসুস্থ হইলে, আমরা আর কাহার মুখ পানে তাকাইব?

ন। না বাবা! আমি তোমাদের জন্য সংসারী, তোমাদের লইয়াই সুখী। তোমরা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, তোমাদের কোন কষ্ট না হয়, আমার এখন জীবনের উদ্দেশ্যই তাই! তোমাদের জন্য আমার শরীর, তোমাদের সুখে রাখিতে আমার শরীর রক্ষার প্রয়োজন, সে বিষয়ে আর আমি নিশ্চেষ্ট হইব না। আমার জন্য তোমারা ভাবিও না।

পিতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় নিযুক্ত হইল। শ্রীশচন্দ্র মুখ হাত ধুইয়া নির্দ্দিষ্ট পাঠে মন দিল। কনিষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র, ভ্রাতার নিকটে বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আপন মনে জ্যেষ্ঠের সহিত এ কথা সে কথা কত কথাই কহিতে লাগিল।

বাহ্যে নগেন্দ্রনাথ মোহিনী ভিন্ন কিছুই জানেন না, যে জগৎ সংসার মোহিনীময়ই দেখে, কুলটার কথাচ্ছলে ত্রুটি তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? তাহা জলবুদ্বুদ বিকাশের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়া থাকে; স্বপ্নে সাধ্বী রমণীর ছায়া মূর্ত্তির সহিতই নগেন্দ্রনাথের সে জ্ঞান লোপ পাই-

য়াছে। প্রতিদিন রাত্রে অন্ততঃ একবার মোহিনীর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ প্রেমালাপ না হইলে, নগেন্দ্র যেন কি এক গুরুতর অভাব বোধ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চৈত্রমাস, মহাষ্টমী—অন্নপূর্ণা পূজা। নগেন্দ্রনাথ দীক্ষিত হইয়া অবধি মাতার আদেশমত অন্নপূর্ণা পূজার দিন অন্ন গ্রহণ করে না। প্রাতঃস্নান করিয়া নিজ গৃহে বালক বালিকাদিগকে লইয়া নগেন্দ্র বসিয়া আছে, এমন সময়ে সুকুমারী আসিয়া নগেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ মোহিনীর মাতাকে দেখিয়া নগেন্দ্র বিস্মিত হইল, মনে মনে ভাবিল, অবশ্যই মোহিনীর কোন আবশ্যকে সুকুমারী আসিয়াছে; উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্রেই ইঙ্গিতে সাদর সম্ভাষণ হইল, বালক বালিকাদিগের সমক্ষে পরস্পর কোন কথাবার্ত্তা হইল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক খণ্ড ক্ষুদ্র পত্রিকা সুকুমারী নগেন্দ্রনাথের সমক্ষে নিক্ষেপ করিল।

নগেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক থাকায় পত্রিকা খানির প্রতি তাহার দৃষ্টিপাত হয় নাই; সতীশচন্দ্র পার্শ্বে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, সহসা পত্রের প্রতি তাহার লক্ষ্য হওয়ায় উঠাইয়া লইতেছিল, এমন সময়ে রমণীর ইঙ্গিতে বালকের হস্ত হইতে নগেন্দ্র পত্র খানি লইল। গত রাত্রে নগেন্দ্র মোহিনীর বাটীতে যায় নাই, তাহার পূর্ব্ব দিবস তাহাকে দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুচতুরা সুকুমারী সে দিন যুবককে বুঝাইয়াছিল যে, অন্নপূর্ণা পূজার কারণ, কয়েক জন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া মোহিনীর ঘরে বসিয়াছে, এখন সে ঘরে যাইলে তোমার লুকোচুরি ভাঙ্গিয়া যাইবে। নগেন্দ্র একক্ষণে প্রেমে অন্ধ, প্রণয়িনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ মানসে মোহিনীর বাটীতে যাইয়া সাক্ষাৎ হইল না, সুকুমারীর কথায় কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সারা রাত্রি আদৌ তাহার নিদ্রা হয় নাই। সে হেতু যথাক্রমে দুই দিবস প্রণয়িনীর সহিত যুবকের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায়, নগেন্দ্রের যে কি কষ্টে দিন কাটিয়াছে, তাহা নগেন্দ্রই বুঝিয়াছে। সুকুমারীর দর্শনমাত্রেই নগেন্দ্র বুঝিল যে, মোহিনীর জন্যই তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, পত্রিকা খানি হস্তগত হইবামাত্র, নগেন্দ্র সোৎসাহে সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এমন সময়ে—"

নগেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে সুকুমারী উত্তর করিল, "পত্র পাঠেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন, মোহিনীর বড় অসুখ, সারা রাত ঘুমায় নাই, সে একবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছে।"

সরলপ্রাণ নগেন্দ্র প্রণয়িনীর অসুখের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, ইতিমধ্যে হস্তগত পত্রিকা পাঠে সুকুমারী প্রমুখাৎ নগেন্দ্র যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সে সমুদয় দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল। সহসা মোহিনীর অসুখ হইয়াছে, এ সময়ে চিকিৎসাদি কারণ যে ব্যয় হইবে, সমস্তই নগেন্দ্রনাথের বহন করা কর্ত্তব্য। ভাবিয়া চিন্তিয়া নগেন্দ্র বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পল্লীস্থ জনৈক বন্ধুর সহিত দেখা করিল। নগেন্দ্র এককালে রিক্তহস্ত হইয়াছিল, এই জন্যই যুবক বন্ধুর বাটীতে যাইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া বন্ধুর নিকট হইতে দশ টাকার একখানি নোট সংগ্রহ করিয়া, নগেন্দ্র আর বাটীতে না ফিরিয়া, এককালে মোহিনীর বাটীতে উপস্থিত হইল। মোহিনী প্রায় এক বৎসর কাল তাহার উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, অসুখের সময় নগেন্দ্র তাহার সবিশেষ সংবাদ না লইয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। নগেন্দ্র দিবাভাগে ইতিপূর্ব্বে এক দিন ক্ষণকালের জন্যও মোহিনীর বাটীতে প্রবেশ করে নাই, আজ লোক লজ্জা সমাজ ভয় কোন দিকে না চাহিয়া, নগেন্দ্র মোহিনীর গৃহে উপস্থিত হইল, দেখিল—মোহিনী একখানি বিছানার চাদর

মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিয়াছে। নগেন্দ্র ভাবিল, মোহিনী প্রকৃতই অসুখে কাতরা, এই জন্যই শুইয়া রহিয়াছে। উদ্বিগ্নচিত্তে নগেন্দ্র, মোহিনীর সন্নিকটে যাইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি মোহিনি, কি হইয়াছে, তুমি অমন করিয়া মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিয়াছ কেন?"

মোহিনী নগেন্দ্রনাথের ভাব ভঙ্গি পরীক্ষার জন্য এতক্ষণ নীরবে ছিল, কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, এককালে প্রেমানুরাগে নগেন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিল, "নগেন! তোমাকে না দেখিতে পাইয়া আমার অসুখ হইয়াছিল, এখন আর আমার কোন অসুখ নাই। তুমি কি নির্দ্দয়, দিনান্তে একবার চক্ষের দেখা দেখিয়া, দুঃখিনীর তাপিত প্রাণ শীতল করিতে, আমার অদৃষ্টগুণে তাহাতেও বিমুখ হইয়াছ।"

ন। মোহিনি! তুমি ভাবিতেছ—আমি আসি নাই, কিন্তু এটী তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। দেখ—আমি দুই দিনই আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি, তোমার সহিত আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষাৎ হয় নাই।

মো। দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিলে কি দেখা হইত না? যা'ক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ অন্নপূর্ণা পূজা, মহাষ্টমীর দিন—৺কালী দর্শনে যাইলে হয় না?

ন। মা'র মুখে শুনিলাম—তোমার অসুখ, তবে কালীঘাট যাইবে কি প্রকারে?

মো। তোমায় না দেখিয়া আমার অসুখ, দর্শনে সুস্থ হইয়াছি। চল না, একত্রে যাইয়া ৺মা'র পূজা দিয়া আসি!

ন। মহাষ্টমীর দিন কালীঘাটে লোকে লোকারণ্য। আজ তোমাদের লইয়া আমি কি প্রকারে তথায় যাই? তাহাতে রবিবার, অনেক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইতে পারে।

মো। ভাল, তবে যাইয়া কাজ নাই। মা, যামিনীরা যাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যান, আমি যাইব না।

ন। কেন, তুমিও যাও না।

মো। না, আমি যাইব না, তোমাতে আমাতে এই খানেই কালীঘাট করিব।

ন। মোহিনি! তোমাদের বাড়ীতে প্রায় এক বৎসর হইল প্রতি রাত্রেই আসি বটে, কিন্তু দিনের বেলা এরূপ ভাবে আসা—আমার এই প্রথম, তাহাতে পাড়ার সকলেই আমাকে চিনে, যদি কেহ দেখিতে পায়?

মো। তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া রহিয়াছ, এখানে তোমাকে কে দেখিতে পাইবে? আজ রবিবার, আজতো আর আফিসে যাইবার তাড়া নাই। দেখ, দুই দিন এস নাই, আমার মনে হইতেছে, যেন দুই বৎসর দেখি নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, তবে যাই যাই বলিয়া আমার মনে আর কষ্ট দাও কেন?

ন। তোমার মা যাইতেছেন, বাটীর আর আর সকলে যাইতেছে, তাঁহাদের সহিত তোমার না যাওয়া ভাল দেখায় না, আমার কথা রাখ, তুমি উঁহাদের সহিত ৺কালী দর্শনে যাও।

"আমার ইচ্ছা নাই, তাই যাইব না, তুমি এখানে একটু বস, আমি আসিতেছি" মোহিনী এই কয়েকটী কথা বলিয়াই গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বহির্দ্দেশ হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিল। নগেন্দ্র একাকী গৃহমধ্যে রহিল। প্রণয়িনীর অসুখের কথা শুনিয়া নগেন্দ্র যে বস্ত্র পরিয়াছিল, সেই বেশেই আসিয়াছিল, অন্যান্য দিন যেরূপ বেশ ভূষায় মোহিনীর বাটীতে আসিয়া থাকে, আজ তাহার সে সাজ সজ্জার কিছুই ছিল না। নগেন্দ্র ভাবিয়াছিল, মোহিনীর চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাটী ফিরিবে, সেখানে আদৌ বিলম্ব হইবে না। গৃহারুদ্ধ হইয়া নগেন্দ্র

ভাবিল—মোহিনী যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত করিতেছে, ইহা হইতে মুক্তি লাভ সহজে হইবার নহে, এখন মোহিনী আসিলে তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া যাইতে হইবে—দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল, মোহিনী ফিরিল না। নগেন্দ্র মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল, কিন্তু মনের উদ্বেগ তাহাকে মনেই সম্বরণ করিতে হইল।

এদিকে মোহিনী বাটীর সকলকে কালীঘাটে পাঠাইয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম কতক সারিয়া নগেন্দ্রের সহিত দেখা করিল। নগেন্দ্র বিশেষ বিরক্ত হইলেও মোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি নয়ন সমক্ষে পাইয়া, সাদরে জিজ্ঞাসা করিল. "মোহিনি! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? কালীঘাট যাইবার কি হইল?"

মো। বাটীর সকলেই তো চলিয়া গিয়াছেন, আমি একলা আছি। তুমি গেলে আমি যাইতাম।

ন! আমি তো তোমায় যাইতে বলিলাম, তবে তুমি গেলে না কেন?

মো। আমি তো তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাওয়া না যাওয়া আমার ইচ্ছা। এখন তুমি আর বাটীতে যাইতে পারিবে না, আমি একা এ বাটীতে, আজ তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে। তাহারা কালীঘাট হইতে ফিরিলে, তুমি বাড়ী যাইও।

ন। মোহিনি! আমি বাটীর কাহাকেও, অধিক কি—মা'র নিকটেও বলিয়া আসি নাই, আমার বাটী যাইতে এরূপ বিলম্ব হইলে, তাঁহারা যে ভাবিত হইবেন! তাহাতে মা খাবার দাবার প্রস্তুত করিয়া, আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন, আমি না গেলে হয়তো তিনিও খাইবেন না।

মো। আজ ছুটির দিন, তাহাতে অন্নপূর্ণা পূজা, আমি তো তোমায় রাত পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতেছি না, তাঁহারা তথায় পূজা দিয়া জলযোগ করিয়াই গৃহে আসিবেন, বেলা দুইটা আড়াইটার মধ্যেই তুমি বাড়ী যাইতে

পারিবে। আর তুমি তো কচি খোকাটী নও যে, মা তোমায় না দেখিতে পাইয়া কাতরা হইবেন!

ন। মোহিনি! অবশ্য আমি যতক্ষণ না বাড়ী যাইব, মা আহার করিবেন না, নতুবা আমার থাকিবার আর কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইতেছে, না খাইয়া কি এতক্ষণ থাকিতে হইবে?

মো। তুমি পেটুক মানুষ, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি, তাহারও যোগাড় করিয়া আসিয়াছি, সেজন্য তোমায় ব্যস্ত হইতে হইবে না।

এইরূপে উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইল। মনোমালিন্যের পর প্রণয়-মিলনে উভয়ে এককালে অভিভূত হইয়া গেল, নগেন্দ্রনাথের পরিধেয় বস্ত্র হইতে নোট খানি সরিয়া পড়িল, নগেন্দ্র মোহিনীর জন্যই নোট খানি আনিয়াছিল, এখন প্রণয়িনীর হস্তে সেখানি ন্যস্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মোহিনী নোট খানি গ্রহণে প্রথমে আপত্তি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রের আকিঞ্চনে আর কোন দ্বিরুক্তি করিল না। উভয়ে প্রেমালাপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, মোহিনী চকিতের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, নিম্নতল হইতে একখানি থালায় কয়েক খানা লুচি ও কতকটা মোহনভোগ লইয়া নগেন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইল। ইতি পূর্ব্বেই নগেন্দ্রের ক্ষুধার সঞ্চার হইয়াছিল, মোহিনীকে খাবার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি! তুমি আমার নিকটে রহিলে, এ সকল খাদ্য সামগ্রী কে প্রস্তুত করিল?"

মো। তুমি আজ মহাষ্টমী করিবে, আমি একজন ব্রাহ্মণকন্যাকে তাই কয়েক খানা লুচি ভাজিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। এখন একটু জল খাও, তরকারি হইলে ভাল করিয়া আহার করিও!

ন। এ খাবার খাইয়া আর আমি কিছু খাইতে পারিব না, মিছামিছি আমার জন্য কতকগুলা পয়সা নষ্ট করিলে কেন?

মো। তোমাকে কি এক দিন আমার খাওয়াইতে সাধ হয় না, কত সাধ্য সাধনা করিয়া তোমায় আনাইয়াছি, এখন আহার কর।

ন। তুমি না খাইলে, আমি খাইব না, এস একত্রে খাই।

শশব্যস্তে মোহিনী থালা খানি আপনার নিকট সরাইয়া লইয়া নগেন্দ্রের মুখে ক্ষেপে ক্ষেপে লুচির গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিল, নগেন্দ্রও মোহিনীর মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মোহিনী দুই এক গ্রাস মাত্র আহার করিয়াই, শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া গ্রহণে অনিচ্ছা দেখাইতে লাগিল। উভয়ে এইরূপে থালা খানির সমস্ত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত করিয়া মুখ হাত ধুইয়া পুনরায় প্রেমালাপে নিযুক্ত হইল।

যে ব্রাহ্মণ-কন্যা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতেছিল, নগেন্দ্র তাহাকে বিলক্ষণ চিনিত, কিন্তু এ স্থানে পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে উভয়েই লজ্জিত হইবে, এ জন্য মোহিনী উভয়ের দেখা সাক্ষাতের কথা আদৌ উত্থাপন করে নাই। সময়-স্রোত অবিরত ধারায় চলিতেছে, ক্ষণ কালের জন্যও সে প্রবাহের বিরাম নাই। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, নগেন্দ্র পুনরায় বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাতে মোহিনী সম্মত হইল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নগেন্দ্র, মোহিনীর গৃহে কাল যাপনে বাধ্য হইল। এদিকে আহার সামগ্রী সমস্ত প্রস্তুত হইলে পাচিকা, মোহিনীকে নিম্নে যাইবার জন্য ডাকিল, মোহিনী তাহার কথা শ্রবণ মাত্রেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক কালে রন্ধনশালায় উপস্থিত হইল। খাদ্য সামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত ছিল, মোহিনী এক থানি থালায় সেই সকল সাজাইয়া নগেন্দ্রের জন্য লইয়া আসিল। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র যে জলযোগ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার এক প্রকার উদর পূর্ণ হইয়াছিল, এ জন্য মোহিনী পুনরায় খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসিলে নগেন্দ্র বলিল,

"মোহিনি! এ আবার কি? আমার তো আহার হইয়াছে, তুমি অনর্থক কতক গুলা পয়সা নষ্ট করিয়াছ!"

মো। নগেন্দ্র বাবু! আমার কি কোন সাধ আহ্লাদ নাই! তোমায় খাওয়াইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই আমি এরূপ আয়োজন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ আর আমায় ওকথা শুনাইও না।

ন। মোহিনি! আমাকে খাওয়ানতো তোমার নূতন নহে, আমি তোমাদের বাটীতে যে দিন আসি, সেই দিনইতো খাইতে পাই।

মো। নগেন্দ্র বাবু! এখন ঠাট্টা বিদ্রূপ রাখুন, খাবার গুলি সমস্তই খাইতে হইবে। আমি আপনাকে খাওয়াইব—এমন কি কপাল করিয়াছি?

বারম্বার এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ দিকে মোহিনী সযত্নে নগেন্দ্রের মুখে আহার সামগ্রী তুলিয়া দিতে লাগিল, নগেন্দ্র, মোহিনীকে পুনঃ পুনঃ খাইবার জন্য অনুরোধ করায় মোহিনী যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করিল। আহারাদির পর পুনরায় উভয়ে প্রেমালাপে নিমগ্ন হইল।

দেখিতে দেখিতে সুকুমারী কালীঘাট হইতে বাটী আসিয়া পৌঁছিল। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, নগেন্দ্র বাটীতে কাহাকেও কোন কথা বলিয়া আসে নাই, প্রণয়িনীর কুহকে যদিও সংসারের কথা সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইতে ছিল বটে, কিন্তু বাটী যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিল। সুকুমারীর পৌঁছন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই নগেন্দ্র, বাটী যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। মোহিনী, নগেন্দ্রনাথের যাইবার বিষয়ে এক্ষণে আর কোন আপত্তি করিল না। নগেন্দ্র ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে নিঃশব্দে মোহিনীর বাটী হইতে বহির্গত হইল।

এদিকে নগেন্দ্রের মাতা আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। নগেন্দ্র স্নান করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছে, কাহাকেও কোন

কথা বলিয়া যায় নাই, সারাদিন তাহার আহার হয় নাই, ইত্যাদি তিনি কতই ভাবিতে ছিলেন। এমন সময়ে নগেন্দ্র মাতৃ সমীপে উপস্থিত হইল। মাতা নগেন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! এত বেলা অবধি আহার হয় নাই, কোথায় গিয়াছিলে?

ন। না—মা! আমার আহার হইয়াছে। এক ব্যক্তির অসুখ হইয়াছে, তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, সেখানেই আহার করিয়াছি। তোমাদের কি এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই?

নগেন্দ্রের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে নগেন্দ্রের মাতা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, “নগেন! আমি যে তোমার জন্য ডালপুরি প্রস্তুত করিয়াছি! তুমি আমাকে কাল হইতে যে বলিয়া রাখিয়াছিলে, তোমার সাধের জিনিষ তুমি না মুখে দিলে, আমরা কি তাহা খাইতে পারি? সেখানে হয়তো তুমি জল খাবার মাত্র খাইয়াছ, তাহাতে আর পেট ভরে কি? আমি তোমায় খাবার দিতেছি—খাও। তুমি না খাইলে মনে বড় ব্যথা লাগিবে।”

ন। মা! আমার জন্য তোমাদের এখনও আহার হয় নাই! ভাল, আমি খাইতেছি, তোমরা খাইতে বস।

তখন নগেন্দ্রের কথায় মাতা কয়েক খানি ডালপুরি ও তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পুত্রের সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া পাত্রস্থিত খাদ্য সামগ্রীর অর্দ্ধেকের অধিকাংশ উদরসাৎ করিল, পুত্রকে আহার করাইয়া মাতা খাইতে বসিলেন।

আহারাদির পর নগেন্দ্র নিভৃত কক্ষে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—কি ছিলাম, কি হইয়াছি। আমার জন্যই মাতার সারাদিন খাওয়া হয় নাই। আজ মহাষ্টমী, বেশ্যাগৃহে আহার করিয়া আমার দিনাতিপাত হইল। দিবা ভাগে কখনও মোহিনীর বাটীতে প্রবেশ করিব না, সে প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হইল না। আমি মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, ভয় সবই বিসর্জ্জন

য়াছি। এতই হীন হইয়াছি যে, লোকের সহিত কথা কহিতেও যেন সাহস কুলায় না, ভগবান আমায় একি করিলেন? তাঁহারই বা দোষ কি? আমি নিজ অপরাধেই নিজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কেন আমি মোহিনীর প্রেমে লিপ্ত হইলাম, কেন আমি জানিয়া শুনিয়া কাল ভুজঙ্গিনীর আশ্রয় লইলাম। এখন আমার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, আমার প্রতি লোকের সহানুভূতি দূরে থাকুক, সংস্রব অবধি কেহ রাখিতে চাহে না। এখন আমাকে দেখিলে হাস্য পরিহাস করে। দিনে দিনে আমার প্রবৃত্তি এতই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, অগ্রে যাহারা আমার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না, তাহারাও উপহাস করে। ধিক্ আমার জীবনে সংসার জ্ঞানে! পিতা আমার ঘোর সংসারী,—জ্ঞানী, সংসারের কত ঘাত প্রতিঘাত তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে—তিনি অচল অটল, তাঁহার সর্ব্ব দিকেই লক্ষ্য। আমি ভাবিতেছি, তিনি আমার কোন সংবাদই রাখেন না, কিন্তু সেটা আমার ভ্রম মাত্র। তিনি সুবিজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও বহুদর্শী। তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমি যাহা কিছু করি, সকলই তিনি জানিতে পারেন। কথায় কথায় একদিন তাহার আভাসও তাঁহার মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল। আমিই হটকারিতা দোষে তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি অবশ্যই: আমার জন্য মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন। এখন একে একে সেই সকল ঘটনাবলী আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে। না—আর না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে সাবধান হইব, চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিব, কুহকিনীর ছলনা-জালে আর আবদ্ধ হইব না। মোহিনী আমার কে? সে যে আমায় ভাল-বাসা দেখায়, আদর যত্ন করে, সে কেবল তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাতুরী মাত্র। আমি তাহার প্রণয়াসক্ত হইয়া অতল সমুদ্রে ডুবিয়াছি, তাহা হইতে এখন আমার উদ্ধারের উপায়—এক মাত্র চিত্তসংযম। জানিনা আমার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না! মোহিনী আমায় এককালে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, কোন সুযোগে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে না পারিলে, আমার আর নিস্তার নাই। নগেন্দ্র মনে মনে এইরূপ যতই চিন্তা করিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাহাতে তাহার হৃদয়যাতনা বাড়িতে লাগিল। বদন মণ্ডলে সে ভাবের বিকাশ পাইলে, নয়ন যুগল হইতে বরিষার বারি ধারার ন্যায় অজস্র অশ্রুপাতে তাহার হৃদয়োদ্বেগ যেন কথঞ্চিৎ উপশম হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ, মোহিনীর সহিত প্রথম দেখা সাক্ষাতে—আলাপ পরিচয়ে, সারল্যের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে, সে মোহিনী প্রতিমাকে সাদরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল। নগেন্দ্র সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া শূন্য প্রাণে, ক্ষুণ্ণ মনে কালযাপনে যে অন্তর্জ্জালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিল, মোহিনীর প্রেমালাপে, আদর যত্নে সে ভাবের ভাবান্তর দেখিয়াছিল। সহজ বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া নগেন্দ্র, প্রণয়িনী সমীপে স্তরে স্তরে পর্য্যায়ক্রমে হৃদয়ের সকল দ্বার উদ্‌ঘাটিত করায়, ছলনাময়ী বাহ্যিক হাব ভাবে তাহার সহিত এরূপ মিলিয়াছিল যে, নগেন্দ্র প্রকৃতই মোহিনীকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কুহকিনীর কুহকে মুহূর্ত্তেকে যে, প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে, তৎ প্রতি না তাকাইয়া নগেন্দ্র, সেই ক্ষণভঙ্গুর কৃত্রিম ভালবাসায় আস্থা সংস্থাপন করিয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু এ ক্ষণস্থায়ী প্রেম—বালির বাঁধ, এই আছে—এই নাই, নগেন্দ্র সে জ্ঞান হারাইয়াছিল।

মোহিনীর বাটীতে নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাত্রেই যাতায়াত ছিল। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হইলেও সাক্ষাতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিত। মোহমুগ্ধ নগেন্দ্র, পাপিয়সী মোহিনী-চরিত্রে কোন ত্রুটিই দেখিতে পাইত না।

দিনে দিনে প্রণয়িনীর প্রতি এতই আসক্ত হইয়াছিল যে, সাধ্যমত মোহিনীর অভাব পূরণ করিয়াও তাহার মন সুস্থ হইত না। প্রিয়তমাকে সাজ সজ্জায় সাজাইয়াও তাহার মন প্রফুল্ল হইত না, সদা সর্ব্বদাই আপনার অবস্থার হীনতার জন্য আক্ষেপ করিত। মোহিনীকে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতি-দানে নগেন্দ্র, মোহিনীর ভালবাসা পাইয়াছে, এই সরল বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া, যুবক জগৎ সংসারে মোহিনীর প্রেমমূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিয়াছে। সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নগেন্দ্র, মোহিনীর সাক্ষাতে এক দিবস বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে কার্ত্তিকের সহিত উকিল বাবুর মোহিনীর বাটীতে আগমন, যথাক্রমে এই দুই দিনের ঘটনাবলী স্তরে স্তরে নগেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকায়, মোহিনীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ সত্বেও তৎসম্বন্ধে দ্বিধার সঞ্চার হইলে, সে সরল প্রাণে তাহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই, যেন মোহিনী চরিত্রে তাহার সংশয় হয় নাই। নগেন্দ্রের ইচ্ছা—মোহিনীকে নয়নের অন্তরাল করে না, দিবা রাত্রি মোহিনী সহবাসেও নগেন্দ্রের হৃদয় যেন তৃপ্ত হয় না, কিন্তু স্বীয় অব-স্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের অধীনে থাকিয়া তাহাকে কালযাপন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহার সে সাধ পূর্ণ হইবার নহে। কালক্রমে নগেন্দ্র মোহিনীর প্রেমে এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতি কার্য্যেই তাহাকে মোহিনীর অনুমতি লইতে হয়, মোহিনী নগেন্দ্রকে সম্পূর্ণ আয়ত্তা-ধীনে রাখিয়াছে। কিন্তু গত দুইটী ঘটনায় নগেন্দ্রের পূর্ব্ব ভাব কথঞ্চিত বিচলিত না হইলেও, যতক্ষণ না প্রণয়িনীর ভাববৈলক্ষণ্য সুস্পষ্ট রূপে তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে বিকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল মন্দ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। উকিল বাবু যে দিন মোহিনীর বাটীতে আসিয়াছিল, নগেন্দ্র মোহিনীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেই, তাহার সন্দেহ দূরীভূত হইত, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নগেন্দ্র এরূপ বীভৎস কাণ্ড করিয়া-

ছিল যে, পরিণামে তাহাকেই আত্মত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পর দিবস মোহিনীর মন রক্ষার জন্য, শশব্যস্তে তাহাকেই তাহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। সুচতুরা মোহিনীর সহিত কথাবার্ত্তায় নগেন্দ্র, আপনার মনের কথা সমস্তই প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু মোহিনীর মনের গতি কিছুই আদায় করিতে পারে নাই। আসিবার সময় পর দিবস স্থানান্তরে যাইতে হইবে বলিয়া—দেখা হইবে না—জানাইয়া আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যখন নগেন্দ্র মোহিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে আসে, সেই সময়ে ক্ষেত্র নামক এক ব্যক্তি মোহিনীদের বাটীতে উপস্থিত ছিল। নগেন্দ্রনাথের সহিত মোহিনীর আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্ব হইতেই সুকুমারীর সহিত ক্ষেত্রের জানা শুনা ছিল। ক্ষেত্র জাতিতে তন্তুবায়। এক সময়ে তাহার গৃহস্থের উপযোগী ধন সম্পত্তি সকলই ছিল, কিন্তু স্বভাব দোষে অভাগা সেই সমস্তই নষ্ট করিয়া, নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এখন তাহাকে লোকের তোষামোদ ও চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভরণ পোষণের সংস্থান করিতে হয়। সোণাগাছি, মেছুয়া বাজার, রাম বাগান প্রভৃতি যাবতীয় বেশ্যাপল্লীতে ক্ষেত্রের বড় খাতির যত্ন, কারণ তাহাকে সহায় করিয়া সময়ে সময়ে দুশ্চরাণীরা লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। নগেন্দ্র গৃহস্থ ব্যক্তি, মোহিনীর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইলেও, সে কায় ক্লেশে তাহা পূরণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সে রূপ মিতব্যয়ে পিশাচিনীদের আশা পূর্ণ হয় না—মন উঠে না। নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় নগেন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে নগেন্দ্র সরল প্রকৃতি, যত দিন না মোহিনী সুবিধা মত অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে, তদবধি মোহিনী, ক্রীড়ার পুত্তলি নগেন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ ভাব দেখাইতে ইচ্ছা করে নাই। আর নগেন্দ্রের কোন হাঙ্গামই নাই, প্রতি রাত্রে মোহিনীর

ইচ্ছামতে নগেন্দ্র আসিয়া কিয়ৎক্ষণ কাটাইয়া নিঃশব্দে বাটী চলিয়া যায়, কিন্তু উকিল বাবুকে লইয়া নগেন্দ্রের সহিত মোহিনীর যে বাক্ বিতণ্ডা হয়, তাহাতে মোহিনী বুঝিয়াছিল যে, নগেন্দ্র আয়ত্তাধীনে আসিলেও, তখনও নিস্তেজ ও চিত্তহীন হয় নাই। কখন কোন প্রকার ছলনা দেখাইলে যদিও নগেন্দ্র, প্রকাশ্য ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ না করুক, তথাচ তাহার মনের ভাব কথাচ্ছলে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

নগেন্দ্র চলিয়া গেলে সুকুমারীর নিকট ক্ষেত্র সুবর্ণপুরের ভূম্যাধিকারীর পুত্র—মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিল। মহেশ্বরের পিতা—কুমারকৃষ্ণ, স্বোপার্জ্জনে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার দুই পুত্র—সর্ব্বেশ্বর ও মহেশ্বর, সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বেশ্বর—পিতৃ সদৃশ। তিনি বিষয় আশয় রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উত্তরোত্তর ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি করেন, কিন্তু কনিষ্ঠ মহেশ্বর, ভোগ বিলাসী হইয়া স্বল্প দিনেই পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তখন মহেশ্বর এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তথাচ জনসমাজে পৈত্রিক মান মর্য্যাদা যথেষ্ট থাকায়, এখনও তাহাকে দীনতার ভীষণ চিত্র সম্পূর্ণরূপে দেখিতে হয় নাই। আবশ্যক মতে উত্তমর্ণের নিকট ঋণজালে জড়িত হইয়াই, তাহার কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে দুই এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া মহেশ্বর কয়েক দিবসের জন্য গণিকা ও সুরার উপাসনায় তন্ময় হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, নিঃসম্বল হইলেই তাহার সে সকল আমোদ আহ্লাদ ফুরাইয়া যায়। বেশ্যামহলে মহেশ্বরের প্রকৃতি অনেকেই অবগত ছিল, ক্ষেত্র প্রমুখাৎ সুকুমারী মহেশ্বরের পরিচয় পাইয়া, বিশেষ আগ্রহ সহকারে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইল। পর দিবস প্রভাতে ক্ষেত্র মহেশ্বরকে লইয়া তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইবে, মহেশ্বর, মোহিনীকে মাসিক এক শত টাকা হিসাবে দুই

মাহার অগ্রিম বেতন দিবে, এইরূপ কথায় কথায় টাকা কড়ির চুক্তি হইয়া গেল। নগেন্দ্রের নিকট মোহিনীর টাকা আদায়ের বিশেষ সুবিধা হয় নাই; মহেশ্বর সুরাসক্ত ও অস্থির প্রকৃতির লোক, তাহার আসা যাওয়ারও কিছুই স্থিরতা নাই, হাতে পয়সা থাকিলে মহেশ্বর ব্যয় করিতেও কোন অংশেই কাতর নহে, সে জন্য অবশ্য প্রাপ্য টাকার কতকাংশ ক্ষেত্রের উদর পূরণে ব্যয় হইলেও, অন্য বাবদে কোন্ না মাসে আরও শতাবধি টাকা মোহিনীর হস্তগত হইবে! এরূপ অবস্থায় এককালে দুই শত টাকা বেতন হিসাবে অগ্রিম আদায় হইবে, মা ও মেয়ে মনে মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষেত্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রের সহিত মহেশ্বরের ইতিপূর্ব্বেই মোহিনী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায়, যাহা যাহা ধার্য্য হইয়াছিল, ক্ষেত্র সেই মত কথাই সুকুমারীকে জানায়। সুকুমারীর কথা মত পর দিবস প্রভাতেই ক্ষেত্র, মহেশ্বরকে লইয়া সুকুমারীর বাটীতে উপস্থিত হইল, অভ্যর্থনার পর কথামত মহেশ্বর, হস্তস্থিত কোরিয়ার ব্যাগ হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া মোহিনীর মাতার হস্তে এককালে দেড় শত টাকা দিল, অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা সপ্তাহ পরে দিবার ধার্য্য হইল। সুকুমারী নোটগুলি সমস্ত বুঝিয়া লইল।

মহেশ্বর যখন এরূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়, তখন তাহার আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না, প্রণয়িনীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াই দিবা রাত্রি অতিবাহিত করে। ক্ষেত্রের সহিত মোহিনীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া সুকুমারীকে টাকা কড়ি দিয়া মহেশ্বর, তখন নিজ পরিচয় জানাইতে লাগিল। চাটুকার ক্ষেত্র প্রতি কথাতেই বাবুর জয় ঘোষণা আরম্ভ করিল। কিছু অর্থ

প্রত্যাশায় ক্ষেত্র মোহিনীর গৃহের বিছানা পত্রাদি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে, মহেশ্বরকে বুঝাইয়া দিয়া তদ্দণ্ডেই মহেশ্বরের নিকট হইতে দশ টাকা হিসাবে তিন কেতা নোট লইয়া, জিনিষ পত্র আনিবার জন্য বাটীর বাহির হইল।

বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে, সংসারী মাত্রেই এ সময়ে যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। গৃহস্থের ঘরে সংসারের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বেশ্যাগৃহে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্র বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলে, মহেশ্বর, মোহিনীকে লইয়া একাকী গৃহ মধ্যে রহিল, উভয়ের উভয়ের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় এখনও কিছুই হয় নাই। মহেশ্বর—সুরাপায়ী লম্পট, অন্য পক্ষে ছলনায় উপপতির মনোরঞ্জন কুলটার উদ্দেশ্য। মোহিনী যে ভাবে শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহাতে এ সকল কার্য্যে সে এখনও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। নগেন্দ্র যথাক্রমে প্রায় এক বৎসর কাল তাহার প্রণয়াসক্ত ছিল বটে, কিন্তু নগেন্দ্রের সময়ে সময়ে ক্রোধের আধিক্য ব্যতীত আর তাহার অন্য কোন দোষ দেখা যায় নাই। নগেন্দ্র, মোহিনীকে ইচ্ছামত ধন দানে সুখী করিতে না পারিলেও, প্রেমিকাকে তুষ্টা রাখিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। মোহিনী, নগেন্দ্রকে পাইয়া মনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল, সহসা এরূপ পরিবর্ত্তনে মোহিনীর মন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু স্বার্থময়ীর পাষাণ হৃদয়ে, নগেন্দ্রের ভালবাসা স্থান পাইয়াও ক্রমেক্রমে যেন লুপ্ত হইতে লাগিল। মহেশ্বর, মোহিনীকে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন ভাই তুমি অমন করিয়া বসিয়া রহিলে! আমি তোমার আশ্রয় লইলাম, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হইতেছ কেন? একবার মুখ তুলিয়া কথা কও।"

মো। না—আমি বেশ বসিয়া আছি। আমার কি সাধ্য যে আপনাকে আশ্রয় দিই, আমিই আপনার শরণাগতা—দাসী।

ম। মণি! তোমার ঐ গুণেই আমি বাধ্য হইয়াছি। তোমার সরল স্বভাব, দিব্য রূপ, আমার মন-নয়ন যেন সদা সর্ব্বদা দেখিতে পায়।

মো। পুরুষ মানুষ সুখের পায়রা, যেখানে ভোয়াজ পায়, সেই খানেই অধিষ্ঠান করে, দুই দিন পরে চলিয়া যায়, আর দেখা সাক্ষাৎ নাই!

ম। দেখ ভাই! আমি ছেলেবেলা হইতেই এই পথের পথিক। বাবার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল, আমায় উপায় করিয়া খরচ করিতে হয়নাই, কিন্তু তোমার কথায় আমার মন ফিরিল, তুমি কি আমায় সস্নেহ নেত্রে দেখিবে?

মো। আপনার অনুরাগে—আমার সোহাগ, অধিনীই সে কৃপা দৃষ্টির প্রত্যাশী।

এইরূপ আলাপ পরিচয়ে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ক্ষেত্র বাজার হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও সাজ সরঞ্জমাদি, লইয়া মহেশ্বর বাবুর নিকটে উপস্থিত হইল। মহেশ্বর তখন মোহিনী প্রেমে বিহ্বল হইয়াছে, ক্ষেত্রের সহায়ে মোহিনীকে পাইয়াছে, খরচ পত্র সমস্ত আপনি যোগাইলেও ক্ষেত্র যাহা করে, তাহাই হয়। কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতেই কমিয়া যায়, মহেশ্বর যে টাকা লইয়া মোহিনীর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, অন্যান্য হিসাবে খরচ পত্রে দুই একদিন পরেই তাহা অর্দ্ধেকে পরিণত হইল, যতক্ষণ না এককালে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, চাটুকার ক্ষেত্র, বাবুর মন যোগাইতে কোন অংশেই ত্রুটি করিতেছে না—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। মোহিনীর দ্বার-দেশের জন্য—দ্বারবান, রন্ধন শালার জন্য—পাচিকা, সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য—দুই জন ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে। সুকুমারীর এককাল এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছিল, সময়ে সংসারের খরচ পত্রে, পোষ্যবর্গের পালনে তাহাদের সকলকেই বিদায় দিতে হইয়াছিল। মহেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া আবার যেন তাহার সে সুখের দিন ফিরিয়া আসিল। মোহিনীর ভাব ভঙ্গিতে সুকুমারী বুঝিয়াছিল যে, নগেন্দ্রের প্রেমে কন্যা অনুরক্তা, সে

বিচ্ছেদে কন্যার হৃদয় জাত সুখলতা শুকাইয়া যাইবে। এ দিকে মহেশ্বর উপপত্নীর মনোভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিলেই স্থানান্তরিত হইবে, এ কারণ তাহাকে অন্তরালে লইয়া সুকুমারী, নগেন্দ্র ও মহেশ্বরের স্বভাব চরিত্র ও অবস্থার আন্দোলন করিতে লাগিল। নগেন্দ্র মধ্যবিত্ত লোক, বেশ্যার আদর যত্নে বা শুশ্রূষায় তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু মহেশ্বর ধনীর পুত্র, তাহাতে সে ব্যক্তি চিরকালই আরাম প্রয়াসী, কোন অংশে কোন প্রকারে সেবার ত্রুটি দেখিলেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া যাইবে, উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় মোহিনী, মাতার ভাব বুঝিল এবং যথা সাধ্য উপপতির মনোরঞ্জনে স্বীকৃত হইল।

সুকুমারীর বাটীতে আমোদ আহ্লাদের সীমা রহিল না। মহেশ্বর বাবুর ব্যয়ে বাটী খাদ্য সামগ্রীতে পূর্ণ, যাহার যখন যেরূপ আহারের অভিরুচি হইতেছে, তদ্দণ্ডেই তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। বহুকাল হইতে সুকুমারী এরূপ খরচ পত্রে ব্যয় কুণ্ঠিতা হইয়াছিল, তাহার দশজনকে দিবার সাধ থাকিলেও, অবস্থা বৈষম্যে মনের বাসনা মনেই বিলীন হইয়াছিল। এক্ষণে রমণীর সেই প্রকৃতি বলবতী হইয়া উঠিল। সুকুমারী গরিব দুঃখীকে মনের সাধে আহার সামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। মহেশ্বরের ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই, মোহিনীর মাতা তাহার যখন যাহা আবশ্যক, জানাইবামাত্র বিলাসী পুরুষ মহেশ্বর তদ্দণ্ডেই তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। একরূপ আমোদ প্রমোদে —আলাপ পরিচয়ে দিন কাটিয়া গেল। মহেশ্বরের প্রেমারা খেলার বিশেষ বাতিক ছিল, প্রথম দিন মোহিনীর বাটী হইতে আদৌ বাহির হয় নাই, পর দিবস আহারাদির পর ক্ষেত্রকে সঙ্গে লইয়া মহেশ্বর ক্রীড়া স্থানে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে মোহিনী, পুনরায় সাক্ষাতের কথা জিজ্ঞাসায়— জানিল যে, সন্ধ্যার পর দেখা হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মহেশ্বর যে দিন মোহিনীর বাটীতে উপস্থিত হয়, সে রাত্রে মোহিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ করে নাই। রজনীযোগে ঝড় বৃষ্টিতে মোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ ইচ্ছা বলবতী হইলেও, নগেন্দ্র, সেদিন মোহিনীর নিকট—পর দিবস আসিতে পারিব না, এইরূপ ভাবে বিদায় লওয়ায়, গমনের ইচ্ছা সত্বেও মনের উদ্বেগ, মনেই সম্বরণ করিয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় যথাক্রমে এক স্থানে কয়েক মাস গতি বিধি, অকস্মাৎ এরূপ অদর্শনে থাকায়, সে রাত্রে নগেন্দ্রের আদৌ নিদ্রা হয় নাই, চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তাহার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। পর দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মোহিনীর বাটীতে আসিয়া প্রণয়িনীর সহিত আলাপে হৃদয় ব্যথার লাঘব করিবে, প্রেমিক পুরুষ প্রেমাবেশে দিবাভাগে মনে মনে এইরূপ কতই কল্পনা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মোহিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নগেন্দ্রের অদৃষ্টে, লোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখাও সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না। ঘটনা চক্রে সে দিবস বিশেষআত্মীয় স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষার ভার নগেন্দ্রের উপর ছিল। এজন্য সর্ব্ব প্রথমে মোহিনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া পরে নিমন্ত্রণে যাইবে, নগেন্দ্র মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিল। কার্য্য স্থান হইতে বাটীতে যাইয়া নগেন্দ্র হাত মুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ জল যোগ করিল, অন্যান্য দিন বালক বালিকাদের লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় কথাবার্ত্তায় কাটিয়া যায়, আজ নগেন্দ্রের সে সাবকাশও হইয়া উঠিল না, নগেন্দ্র সন্ধ্যার পরেই বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষে বাটী হইতে বহির্গত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে মোহিনীর সহিত দেখা হয় নাই, প্রণয়িনীর অভাবে নগেন্দ্রের হৃদয় মরুভূমি প্রায় হইয়াছে, নগেন্দ্র, মোহিনী মূর্ত্তির অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতেছে। বাহির হইয়াই নগেন্দ্র প্রথমে মোহিনীর বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। অন্যান্য দিন মোহিনীর বাটীতে কোন সাড়া শব্দ থাকে না, নগেন্দ্র

আসিবামাত্র দ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়, আজ যেন নগেন্দ্র প্রতি পদে পদেই সঙ্কুচিত ও সন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। দ্বারদেশে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া যুবক মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল, বিচলিত চিত্তে নগেন্দ্র দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য কোন কথা বলিতে পারে নাই, মৌনাবলম্বনে এক পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে একটী রমণী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে কখন নগেন্দ্র, এই স্ত্রীলোকটীকে এ বাটীতে দেখে নাই, অগত্যা তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়াই মোহিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহটীতে তখনও সন্ধ্যার বাতি দেওয়া হয় নাই, অথচ বাটীর অন্যান্য স্থান আলোক-মালায় শোভিত হইয়াছে, ইহাতে নগেন্দ্রের চিত্ত কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইল, কিন্তু নগেন্দ্র কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একাকী গৃহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এতদিন নগেন্দ্র মাদুর পাতা বিছানায় আসিয়া বসিয়াছে, আজ গৃহের আর সে শ্রীছাঁদ নাই, মাদুরের পরিবর্ত্তে শীতল পাটি বিন্যস্ত রহিয়াছে, তদুপরি একটী নূতন আলবোলা শোভা পাইতেছে, অকস্মাৎ এরূপ দেখিয়া নগেন্দ্রের সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য দিন নগেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় মোহিনী উৎসুক চিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতে থাকে, আজ নগেন্দ্র গৃহে তিন চারি মিনিট একাকী রহিল, অথচ কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। এদিকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে মোহিনীর কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। এরূপ ব্যাপারে নগেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, মনের উদ্বেগে যুবক আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, ভয়ে বিস্ময়ে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে তাহার পরিধেয় বস্ত্র গুলি সিক্ত হইয়া গেল, নগেন্দ্র বিষম সমস্যায় পড়িল। তাহার এরূপ অবস্থার কিছুক্ষণ পরে, মোহিনীর মধুনামা এক ভ্রাতা আসিয়া নগেন্দ্রের সমক্ষে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া নগেন্দ্র ব্যাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি কোথায় ?" সে নগেন্দ্রের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিল, "আপনি এ ঘর হইতে উঠিয়া আসুন।"

নগেন্দ্র বুঝিল অবশ্যই কি একটা কাণ্ড বাধিয়াছে—কিন্তু তাহার মনের গতি যেরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে এ সময়ে কোন কার্য্য করিবার শক্তি কোথায়? মোহিনীর বাটী হইতে যতক্ষণ না যুবক বাহিরে আসিতেছে, তদবধি তাহাদের কথা মতেই তাহাকে চলিতে হইবে। মধুর কথা শেষ হইবামাত্র, নগেন্দ্র, মোহিনীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া মধুর পশ্চাতে পশ্চাতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার কালে, ছাদের উপর নগেন্দ্রের দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, দেখিতে পাইল, দুই তিনটী পুরুষ তথায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তখন তাহার সকল সংশয় দূর হইল। গণিকালয়ে বারাঙ্গনা সংস্রবে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে, পদে পদে তাহাকেই লাঞ্ছিত হইতে হইবে, অধিকন্তু যেরূপ অবস্থায় নীত হইয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহাকেই অবমানিত ও অপদস্থ হইবার কথা। অগত্যা নগেন্দ্র, মনের দুঃখ মনেই চাপিল। নগেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়াই সুকুমারী ও মোহিনীকে দেখিতে পাইল, অন্যান্য দিন তাহারা যেরূপ সানন্দে তাহার সহিত আলাপ করে—কথাবার্ত্তা কহে, আজ তাহাদের আর সে ভাব লক্ষ্য হইল না, নগেন্দ্র উভয়ের মুখেই ম্লান ভাব লক্ষ্য করিল। মোহিনী শয্যায় শায়িতা—দ্বারদেশে সুকুমারী উপবিষ্টা।

নগেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে সুকুমারী তাহাকে নিকটে বসাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নগেন্দ্র বাবু! একটা কাজ বড় অন্যায় করিয়াছি, আপনি আমাদের বিশেষ সমাদর করেন, আমাদের যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয়ে আপনার দৃষ্টিও আছে, কিন্তু কাজটা ভাল নহে বলিয়া লজ্জাবশতঃ তাই আপনাকে কথায় কথায়ও জানাইতে পারি নাই যে, সুবর্ণপুরের মহেশ্বর বাবু কাল হইতে এখানে রহিয়াছেন, দুই মাহার বেতন অগ্রিম দিয়াছেন, লোকজন সমস্তই বাহাল করিয়াছেন। মোহিনীকে রাখিতে তাহার একান্ত জিদ, বড় লোকের ছেলে, ওরা তত লোকের সুখ দুঃখ বোঝে না, নিজের

সুখ লইয়াই ব্যস্ত, ফাঁকের ঘরে কিছু পাওয়া গেল, তুমিও যেমন, ক দিনই বা থাকিবে? ভাঙ্গা ঘরে জ্যোৎস্নার আলো, যে দিন যায়, সেই দিন ভাল; চোকের নেশায় এসেছে, আবার চোকের নেশায় দু দশ দিন পরেই সরে পড়বে। এর জন্য আপনি মনে কিছু করবেন না, আপনি যেমন আছেন, তেম্নি থাকবেন, তবে দিন কয়েক বড় দেখা শুনা করবেন না। একবার সামলে নিই, তার পর সবই ঠিক চলবে।"

সুকুমারীর কথায় নগেন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রি যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, যে উৎসাহে নগেন্দ্র আজ প্রণয়িনীর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সহসা সুকুমারী প্রমুখাৎ এরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণে তাহার মস্তকে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তথাচ নগেন্দ্র বহু কষ্টে হৃদয় বেগ সম্বরণ করিয়া হাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিল, "ভাল, বেশ হইয়াছে—মোহিনী অনেক দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করিতেছিল, মহেশ্বর বাবু যে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই আনন্দের সম্বাদ।"

আরও দুই একটী কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কথা কহিতে কহিতে, নগেন্দ্রের কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিল, তাহার মুখ হইতে আর একটী কথাও বাহির হইল না, নগেন্দ্র অতি কষ্টে বিশেষ সাবধানে মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিল। তদ্দণ্ডে মোহিনীর বাটী হইতে বাহিরে আসিবার জন্য নগেন্দ্র উৎসুক হইয়া নম্রভাবে সুকুমারীকে বলিল, "খাবার আনিয়াছি, ও ঘরে আছে। আজ আমার একটী নিমন্ত্রণ আছে, তথায় যাইতে হইবে, যদি অনুমতি করেন—যাই।" মাতার সহিত নগেন্দ্রের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল, মোহিনী, নগেন্দ্রের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল, কিন্তু এ তাবৎ কাল তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হয় নাই। নগেন্দ্রকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, মোহিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিকটে আহ্বান করিল। সুকুমারী কন্যার ভাব বুঝিয়া, কার্য্যচ্ছলে গৃহ হইতে বাহিরে গেল। নগেন্দ্র ও মোহিনী

ব্যতীত, সে গৃহে সুকুমারীর অন্য দুইটী বালক ছিল, তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠটী নিদ্রিত, অপরটী মধু। মোহিনী ধীরে ধীরে ছাদের দিকের জানালাটীর নীচের বাইল দুইটী বন্ধ করিয়া দিয়া, নগেন্দ্রের হাতে হাত দিল। প্রণয়িনীর ইঙ্গিতেই যুবক পার্শ্বে বসিয়াছিল, এক্ষণে হাতে হাত পাইয়া নগেন্দ্রের হৃদয় কম্পিত হইল, এ ভাব মোহিনীর নিকট অব্যক্ত রহিল না। ছাদের দিকের জানালার উপর বাইল, উন্মুক্ত রহিয়াছে, তথায় মহেশ্বরের মোসাহেব ও অন্যান্য অনুচর বসিয়া রহিয়াছে, চতুরা মোহিনী, নগেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা দেখাইতেও সতর্ক হইল। যুবক, মোহিনীর রূপ-সাগরে নিমগ্ন হইলেও আপনার অবস্থা বুঝিয়া অতি কষ্টে আত্ম সংযম করিল।

কার্য্যসূত্রে সুকুমারী বাহিরে ছিল, এক্ষণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রেমিক প্রেমিকা তাহার আগমনে কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। নগেন্দ্র বুঝিল, মোহিনীর সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে, মহেশ্বর তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দী হইয়াছে, এ সময়ে এখানে অপেক্ষা করায়, পরিণামে হয়ত হাঙ্গাম বাধিতে পারে। এই আশঙ্কায় নগেন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া সুকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আসিবার কালে নগেন্দ্র, মোহিনীর এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য মুখে আনন্দ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিল। যুবকের কথায় সুকুমারী বিশেষ আনন্দ ভাব দেখাইল, কিন্তু মোহিনী অবনত মস্তকে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন দিল। নগেন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিল না, কারণ তাহা দেখিতে গেলে, নগেন্দ্র তখন বাটী ফিরিতে পারে না, কিন্তু সেখানে আর তাহার স্থান কোথায়?

নগেন্দ্র, সুকুমারীর বাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু যে দারুণ ব্যথায় তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে, সহসা অভাগার শিরে যে অশনিপাত হইয়াছে, মৃদু মন্দ গমনে সেই সকল চিন্তাস্রোতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া নগেন্দ্র বহুক্ষণ পরে নিম-

রিক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোক জনের সম্মিলনে নগেন্দ্রের চিত্ত প্রকৃতস্থ না হইয়া অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল, যুবক মনে মনে মোহিনীর বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাঁহার প্রাণ ততই ব্যাকুল হইল। পংক্তি ভোজনে বসিলেন বটে, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী তাঁহার মুখে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, যথা সময়ে বিদায় গ্রহণ করিয়া শূন্য প্রাণে বিকৃত চিত্তে নগেন্দ্র বাটী ফিরিলেন। একমাত্র মোহিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই অভাগার সে রাত্রি নিদ্রা হইল না, দুঃখের রজনী প্রভাত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাস ভোগ বাসনা—পরিতৃপ্ত হইবার নহে, পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে সমধিক বৃদ্ধি পায়। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ব্যতীত, ইহার প্রবল প্রকোপ হইতে অব্যাহতি লাভ—প্রায়ই ঘটে না। নগেন্দ্রনাথ বাল্যাবস্থায় আমোদ প্রমোদ-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়াছেন, পরিণামের শুভাশুভ ভাবিয়া দেখেন নাই। বয়োবৃদ্ধি সহ উত্তরোত্তর বিলাসী হইয়া আত্মহারা হইতে বসিয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে মনুষ্য জনসমাজে গণ্য হয়, দশের নিকট মান্য পায়, আজ নগেন্দ্র এতই বিপন্ন যে, সেই শক্তি অভাবে এরূপ দৃষ্টি হীন :হইয়াছেন, সে এক সময়ে যাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় নগেন্দ্র মনে আনন্দ পাইতেন, সদা সর্ব্বদা যাঁহাদের নিকটে থাকিতে অভিলাষ করিতেন, মোহিনীর সংস্রবে এখন তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবারও তাঁহার সাবকাশ হইয়া উঠে না। ইহ জীবনে যাহাদের সংস্পর্শ—ঘৃণিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, দর্শন মাত্রে পাপের বিভীষিকা জানিয়া কুণ্ঠিত হইতেন, যাহাদের সম্মুখে যাইতে কখনও সাহস করিতেন না, সময়ের ঘোর পরিবর্ত্তনে এখন তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, প্রিয়—অপ্রিয় হইয়াছে, অপ্রিয়—প্রিয়

হইয়াছে। নয়নানন্দ পুত্র, কন্যাকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে কত আমোদ আহ্লাদে তাঁহার দিন কাটিয়াছে, এখন তাহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দৃষ্টি পাত করিতেও যেন তিনি ভুলিয়া যান। সে ভুলেও নগেন্দ্র বিশেষ বিচলিত হন না,—আমোদ প্রমোদে যেন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য।

নগেন্দ্রনাথ বড়ই বিপন্ন, সকল দিকে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এক একবার চিত্ত সংযমের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরক্ষণে দুষ্প্রবৃত্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লয়, ভাল মন্দ বিচার করিতে তাঁহার শক্তি কুলায় না। এক দিকে সংসার ধর্ম্ম, সমাজ বন্ধন—অন্য দিকে গণিকা-প্রেম! নগেন্দ্র কোন দিক্ রক্ষা করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। মোহিনীর মন্মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া নগেন্দ্র বিপথগামী হইয়াছেন, যে সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্যে এক দিনের জন্য নগেন্দ্র অবহেলা করেন নাই, আজ তাঁহার সেই সাধের সংসারে বীতস্পৃহা জন্মিয়াছে। কালক্রমে মোহিনী তাঁহাকে আত্মবশে আনিয়াছে, কুহকিনীর প্রেমালাপে নগেন্দ্র সজ্ঞহারা হইয়াছেন। এ বিকৃত অবস্থায় রূপজ মোহে যে, নগেন্দ্র মোহিত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

নগেন্দ্রনাথের এক্ষণে আর মতি স্থির নাই। কাহার সহিত কিরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; সকলেই তাঁহার বিনয় নম্র বচনের ও মিষ্টালাপের জন্য প্রশংসা করিত, কিন্তু এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হয়ত সামান্য কারণে লোকের নিকট এরূপ অপ্রিয় হইয়া উঠেন যে, তাঁহার সহিত অপরের কথাবার্ত্তা এককালে রহিত হইয়া যায়। বিষয় কর্ম্মে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল, আজকাল তাহাতেও আর তাঁহার মন বসে না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এক দিন নগেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় বন্ধু দেবেন্দ্র আসিয়া দেখা দিলেন। সময়ে নগেন্দ্রনাথের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, দেবেন্দ্র তাহা সবিশেষ জানিতেন। দিন দিন বন্ধু বিপথগামী হইতেছে, কোন প্রকারে তাহাকে প্রকৃতস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আজ নগেন্দ্রের নিকট আসিয়াছেন। বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাতে নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেবেন্দ্র! কেমন আছ? ভাই বহুকালের পর দেখা সাক্ষাৎ, পথ ভুলিয়া কি এ দিকে আসিয়াছ?"

দে। না—ভাই! আমি তোমার সহিতই দেখা করিতে আসিয়াছি, তুমি ভুলিলেও আমরা তোমায় ভুলি নাই, তোমার সমস্তই জানিতেছি, এত দিন তোমার ভাবে—তোমার সম্মুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু মনত বুঝে না, তাই আজ আবার দেখিতে আসিলাম, ভগবান তোমার মতি গতি ফিরাইলেন কি—না! যদি ফিরাণ—আমরাতো তোমারই আছি, তুমিই আমাদের পর করিয়াছ। ভাই! তুমি কেমন আছ?

ন। আমি বেশ আছি। তোমার খবর কি?

দে। আমার আর নূতন খবর কি ভাই! এখন তোমার নূতন খবরই —আমার খবর।

ন। কেন?

দে। আগে সদা সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইত, এক সঙ্গে বসা দাঁড়ান ছিল, তুমি ভাই কয়েক মাস ধরিয়া আরতো দেখাও কর না, জানি না— তোমার এ কি ভাব দাঁড়াইয়াছে।

ন। ভাই দেবেন্দ্র! আর আমাকে লজ্জা দিও না, তুমি আমার বহু-কালের বন্ধু, নূতন আলাপ নহে, তোমার কাছে আমার কোন কথাই

গোপন থাকে না! তোমায় অধিক আর কি বলিব, জানিও তোমার নগেন্দ্র মরিয়াছে।

দে। ভাই! এ কেমন কথা! তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া যখন হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, মনোভাব আমার নিকট গোপন রাখিতেছ কেন?

ন। ভাই! আমি যে তোমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি না, তাহাতে কি বুঝিতে পার নাই যে, আমার আমিত্ব লোপ পাইয়াছে—লোকের নিকট আমার পরিচয় দিবার আর কি আছে? তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার নিকট আমার গোপন রাখিবার কিছুইতো নাই! দেখ, স্ত্রীর মৃত্যুই আমার এই অধোগতির মূল, আমি স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া পাষাণপ্রতিমার পূজা করিতেছি। সেই অনুরাগেই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সংসারে আর আমার আসক্তি নাই। আমি যাহা করিতেছি, সকলই বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে স্রোতাভিমুখে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি, তাহার প্রতিরোধ করিতে আমার শক্তি কোথায়? ভাই দেবেন্দ্র! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, যদি বন্ধুর জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিভীষিকা হইতে আমায় রক্ষা কর, উদ্ধার কর। আমি সব বুঝিতেছি, সব জানিতে পারিতেছি, কিন্তু কামিনী-কটাক্ষ আমায় অন্ধ করিয়াছে। উভয়ে নয়নে নয়নে মিলিত হইলেই, আমি তাহার রূপসাগরে ভাসিয়া যাই, আর আমা[illegible] কোন কথাই স্মরণ থাকে না। এ আত্মহারা অভাগাকে তুমি কি উদ্ধার করিবে?

দে। ভাই নগেন! আত্মপরিতাপই আত্মোন্নতির মূল কারণ। তুমি যখন নিজ অপকর্ম্মের জন্য এরূপ অনুতপ্ত হইতেছ, স্থির জানিও—তোমার কোন আশঙ্কা নাই। অবশ্যই ভগবান তোমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন। তোমার এরূপ দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক নাই।

ন। দেবেন! দিনে দিনে আমার হৃদয়ের যে কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,

যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে আমার ব্যথায় ব্যথিত হইতে। ভাই, আমি বড় কষ্ট পাইতেছি, এ অন্তর্জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে। আমায় বাঁচাও—তাপিত প্রাণে শান্তি দাও! আমি যখন পতি-প্রাণা সাধ্বী সতীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কুহকিনী কুলটায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি?

ন। দেখ, তুমি নিতান্ত বাতুলের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছ! কেন? কি হইয়াছে যে, তুমি এরূপ বিপন্ন ভাব দেখাইতেছ! তোমার এরূপ আত্মভর্ৎসনার প্রয়োজন নাই। যখন অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ আসিয়াছে, স্থির জানিও—শীঘ্রই তুমি আবার যে নগেন্দ্র, সেই নগেন্দ্রে পরিণত হইবে। আমার কথা শুন, মন স্থির কর। উদ্বিগ্ন চিত্তে কোন কার্য্যই হয় না। বেশ্যার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তোমার এই অধোগতি হইয়াছে, সকলই আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ইহাও বলি যে, মোহিনী এখনও তোমাকে হস্তগত করিতে পারে নাই। মনের উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা কর, মায়া মোহ একে একেই তোমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি আবার নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইবে।

ন। ভাল! কিন্তু আমি যে কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছি না, অহোরাত্র কুহকিনীর মূর্ত্তি যে, আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে না করিতে পিশাচিনীর বিকট মূর্ত্তি আমার নেত্র-পথে আসিয়া দাঁড়ায়, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই আমি এককালে উদ্যম ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়ি। ঈশ্বর আমাকে এ কি বিপদে ফেলিয়াছেন?

দে। ভাই! তোমার আশঙ্কার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। মানুষ যখন কুপথগামী হয়, তখন তাহার ভাল মন্দ ভাবিবার শক্তি থাকে না। দিন দিন যতই পাপ প্রশ্রয় পায়, উত্তরোত্তর লজ্জা, ভয়, মান, সম্ভ্রম সকলই

তাহার নষ্ট হইয়া যায়। তোমার সে দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভগবানের কৃপায় যখন মোহিনী মূর্ত্তিতে, পিশাচিনীর পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছ, তখন তোমার উদ্ধার লাভ, অসম্ভব নয় জানিও। দেখ, গ্রহ বৈগুণ্যে সকল-কেই বিপথগামী হইতে হয়, সে সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য—কোন কথাই স্মরণ থাকে না, কিন্তু সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন নিজ কার্য্যের পরিণাম ফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন যে কোন প্রকারে হউক, তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। আজ তোমার সেই সুদিন আসিয়াছে, যখন তুমি অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য আত্মায় এরূপ ধিক্কার দিতেছ, তখন তোমার আর অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ন। দেবেন্দ্র! ঈশ্বর কি আমার প্রতি সদয় নেত্রে দৃষ্টিপাত করি-বেন? আমি যে অসদাচারে তাঁহার নিকট পদে পদে অপরাধী হইয়াছি, তাঁহাকে এককালে ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি এ অধমের প্রতি কেন কৃপা করিবেন? কিন্তু মনে হইতেছে—আমি ভুলিলেও তিনি আমায় ভুলেন নাই। ভুলেন নাই বলিয়াই তিনি আজ তোমার রূপে, আমার নিকট আসিয়াছেন। নচেৎ তুমি আসিবে কেন? তুমি দেবতা, আমি পশু, দেবতা কখন পশুর বন্ধু হন না, ভগবান সকলের বন্ধু, তাই বুঝি আমায় ভুলিতে পারেন নাই।

দে। ভাই! নিজের চরিত্র সংশোধনে উদ্যোগী হও, বিপদের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। বেশ্যাপ্রেমে আসক্ত হইয়া কত শত জ্ঞানী ব্যক্তি, আত্ম চৈতন্য হারাইয়া আজীবন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বল্প দিনের মধ্যে তোমার যে প্রবৃত্তির ভাবান্তর হইয়াছে, চৈতন্য হারাইয়া যে পুনরপি চৈতন্য লাভ করিয়াছ, ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ কর। ঈশ্বর অবশ্য রক্ষা করিবেন।

বন্ধুদ্বয় মিলিয়া এইরূপ কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। নগেন্দ্র মনে

মনে আত্মসংযমে উদ্যোগী হইলেন। দেবেন্দ্র, বেশ্যাপ্রেম যে অস্থায়ী ও ক্ষণ-ভঙ্গুর, তাহা কথাচ্ছলে বন্ধুকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ কাল কথায় কথায় সুকুমারীর সহিত মোহিনীর নিত্য কলহ। মা চাহেন, কন্যাকে সুখিনী দেখিতে—সে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, ভাল খাইবে, সুকুমারীর এই কামনা; কন্যার তাহাতে মন উঠে না। বাহ্যিক হাবভাবে লোককে মোহিত করা বেশ্যার ধর্ম্ম। সুকুমারী ভদ্রলোকের কন্যা, দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া অধোগতির চরম সীমায় উপনীত; গৃহস্থের বধূ থাকিয়া দাসী বৃত্তিতে যদি তাহার জীবন যাপিত হইত—এ অখ্যাতি, এ কলঙ্ক তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। বয়সে প্রবীণা হইয়া সুকুমারী, ন্যায় অন্যায় সকলই বুঝিয়াছে, অথচ মায়ের প্রাণ, পুত্র কন্যাকে প্রসন্ন দেখিতে চায়, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী —এ নিঃস্বার্থ ভালবাসা, জননীর হৃদয়ে যে রূপ প্রতিফলিত হয়, সে ভাব আর কোথাও লক্ষিত হয় না। নগেন্দ্রের বিদায়ে, মহেশ্বরের আগমনে, মা ও মেয়ের মনান্তর চলিতেছে, মোহিনী, সুকুমারীর উপদেশ মতে চলে না, মাতা যাহা বলেন, কন্যা তাহার বিপরীত আচরণে অগ্রসর।

দেহ বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ বারাঙ্গনার ধর্ম্ম, হাব ভাবে লম্পটের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয়, অগত্যা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উপপতির মন যোগাইয়া চলিতে হয়। বেশ্যাপুত্রী মোহিনী—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। নগেন্দ্র সন্নি-

লনে মোহিনী আনন্দ লাভে পরিতৃপ্ত হইতে না হইতে, তাহাকে মাতার প্ররোচনায় অন্যের মন মোহনে ব্রতী হইতে হইয়াছে, মানসিক এরূপ পরিবর্ত্তনে ছলনাময়ী মোহিনীর প্রাণেও, দারুণ বেদনা লাগিয়াছিল। সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও, সাধের সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন, কুলটার কঠোর হৃদয়েও এ ইচ্ছা বলবতী হয়, রক্ত মাংসে গঠিতা রমণী মোহিনী সে সাধে বঞ্চিত হইবে কেন? সংসারের ভাব গতি দেখিয়া তাই মোহিনীর এ ভাবান্তর। দারিদ্রে অনাহারে ভালবাসা, সম্মিলনে যে সুখ এখন অর্থ সুখভোগেও তাহার মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই। বিদায় দিনে নগেন্দ্র সমীপে যখন মোহিনী কাঁদিল, তখন সে দৃশ্যে সুকুমারী ভীত হইয়াছিল, সে ভীতি অপনোদনে যতই আন্দোলন, ততই সংসার বিশৃঙ্খল, সে বিশৃঙ্খলায় আজ মোহিনী যেন উদাসীনা।

মাতার সহিত কলহে, মোহিনী মনোক্ষুণ্ণ হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ যতই ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাহার চিত্ত ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইতে লাগল। আজ মোহিনী, শান্তিবিধায়িনী রজনীযোগে নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকিনী শয্যাগ্রহণে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইল। মোহিনী তখন মহেশ্বরের রক্ষিতা, মহেশ্বর পারিষদ সহ সে দিন স্থানান্তরে ছিল, রাত্রে আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। মোহিনীর পক্ষে ইহাতে বিশেষ সুযোগ হইল, রমণী সে উপপতির প্রতি আসক্ত নহে, তবে মাতৃভয়ে তাহাকে বিদায় করিতেও পারিতেছে না।

সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে স্থান পাইয়া মোহিনী সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রনা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইল। বিষম উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে মোহিনী শয়ন করিয়াছিল, কিছুক্ষণ সুনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া রমণী স্বপ্নে, তাহার পার্থিব দেবতা—স্বামীর দিব্য মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিল। বহুদিনের অন্তরালে পতির সন্দর্শন হইলেও, মোহিনী

দেখিল, স্বামী তাহার শীর দেশে আসীন হইয়া সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সই! বিবাহবাসরে যে বরমাল্যে আমাকে ভূষিত করিয়াছিলে,—জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব তোমার—বলিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলে, নয়নে নয়নে প্রথম সাক্ষাতে যে মধুর হাসি হাসিয়াছিলে, এখন সে সব তোমার কোথায়?"

"মানুষ জন্মিলেই মরে, জন্ম মৃত্যুর সন্ধিস্থানে বিবাহ। উদ্বাহ বন্ধনে স্ত্রী পুরুষ কায় মনে একত্র মিলিত হয়, সে মিলনে তোমায় আমায় যখন একবার মিশিয়াছি, তখন কঠোর কাল শাসনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও, তোমায় আমার সে সম্বন্ধতো ঘুচিয়া যায় নাই, সে যে জীবন মরণ সম্বন্ধ! কত উচ্চ আশা হৃদয়ে ধরিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন, অকালে আমার সংসার লীলা শেষ হইয়াছে, তাই কি প্রিয়তমে আমায়, সে প্রেমপাশ হইতে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করিতেছ? সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, ইহ পরলোকে তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—তবে, কেন আমায় বিস্মৃতি-সলিলে ভাসাইয়া দিয়া অন্যের উপাসনায় সংযত হইয়াছ।"

স্বপ্নাবেশে মোহিনী যেন সে মোহিনী আর নাই, আত্মহারা ভাবে বলিল, "স্বামিন্! প্রভু!—কোথায় তুমি? উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি। এত দিন পরে কি অধিনীকে মনে হইল? নাথ, রমণীর সর্ব্বস্ব ধন—তোমায় হারাইয়াই আমার এ অধোগতি। তোমায় পাইয়া মনে মনে কত স্পর্দ্ধা ছিল যে, পতির পূজায় জীবন সার্থক করিব, তোমার অভাবে পাপপঙ্কে গ্রথিত হইয়াছি, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া পিশাচিনীর মনের সাধ মনেই মিলাইয়াছে! এ যৌবন বিকাশের বহু পূর্ব্বে স্বর্গের দেবতা তুমি—স্বর্গে, অমরের পারিজাত মর্ত্তের ভোগ্য নহে, আমার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না। তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কণ্টক, এ অসতী স্পর্শে পবিত্র দেহ কলুষিত কর নাই।

তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া মনের সুখে কাটাইব, সে সৌভাগ্য অভাগিনীর অদৃষ্টে ঘটিল না।"

মোহিনীর কথায় ছায়ামূর্ত্তি যেন উত্তর করিল, "যে যাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগ করে, একবার পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া কি, তাহা হইতে অব্যাহতি নাই? এ যুক্তিতো সঙ্গত নহে! মনের বল থাকিলে, স্থির জানিও কোন কার্য্যেই তোমার ব্যাঘাত ঘটিবে না, একাগ্র চিত্তে ভগবৎ সাধনে উদ্যোগী হও, অবশ্য ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তুমি আমি যে বন্ধনে বাঁধা আছি, জীবনে মরণে তাহা হইতে পৃথক্ হইব কেন? ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যে দিন তোমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছি, তোমার শত সহস্র অপরাধ হইলেও, আমাকে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

মোহিনী যেন সকাতরে বলিল, "নাথ! তোমার অভাবে আমার এই হীনাবস্থা, তুমি সহায় থাকিলে আমার দেহ বিনিময়ে দিন পাত করিতে হইবে কেন? যদি কৃপানেত্রে দাসীর প্রতি চাহিয়া দেখিলে, অধিনীর এই ভিক্ষা যে, দাসী বলিয়া চরণে ঠাঁই দিও—যেন তোমার অবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট দিন, মনের সুখে কাটাইতে পারি। তোমায় লইয়া আমার সংসার, বিধাতা যখন পার্থিব সম্বন্ধে উভয়কে পৃথক্ করিয়াছেন, যাহাতে পরলোকে আমার সদগতি হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিও। সংসারের সাধ আহ্লাদ আমার সকলই ফুরাইয়াছে। পাপের দেহ—পাপ ভরা, জানি—বসুমতীতে আমার ঠাঁই নাই, ভদ্র ইতর সকলেই আমায় অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখে, তবে তোমার বলে যদি বলী হইতে পারি, তোমার কৃপায় ভ্রান্ত মন যদি সুপথে ফিরে, জানিব—তোমার আমার এ সাক্ষাৎ সার্থক।"

ছায়ামূর্ত্তি আবার যেন বলিল, "উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত, একাগ্র চিত্তে বার বার সে পথের পথিক হইতে চেষ্টা কর, অবশ্য মনোরথ পূর্ণ হইবে। কুসংসর্গে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয় না, উত্তরোত্তর কলুষিত হইতে থাকে। তোমার

উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, নীচের সহবাসে নীচত্ব লাভ করিয়াছ, নিকৃষ্টের মতি গতি উর্দ্ধমুখী হইতে পারে না, তবে বহু সাধ্য সাধনায় এ স্রোতের গতি ফিরিতে পারে, কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ ও বহু আয়াস সাধ্য।"

তখন মোহিনী যেন বলিল, "তবে কি আমার সদ্গতি হইবে না? নরকের কীট নরক ভোগে জন্মিয়াছি, মোহে মুগ্ধ হইয়া আর কত দিন, এ কষ্ট ভোগ করিব?"

সুখ স্বপ্নে স্বামীর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পরে মোহিনীর সজ্ঞা লাভ হইল, উন্মীলিত নেত্রে বহুদিনের বাঞ্ছিত পতি দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিল না; অভাগিনী তন্দ্রাবশে পতি সকাশে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, জাগ্রতে তাহার সে আশার ভেলা অতল তলে ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন প্রাণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উদ্বেগিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরস্পর দেখা সাক্ষাতে, একত্র সহবাসে, একের অনুরাগ অন্যের প্রতি প্রসর্পিত হইয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা যাহার সহিত বসা দাঁড়ান, মনের কথা যাহার নিকট না জানাইলে, কেমন যেন একটা গুরুতর অভাব জ্ঞান হয়, তাহার সহিত কোন গতিকে মিলিত না হইতে পারিলে, প্রাণে স্ফূর্ত্তির বিকাশ পায় না, কেন এমন হইল, এই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন ভাবে কালক্ষেপ করিতে হয়। সে সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন কিছুই থাকে না, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে শৈথিল্য প্রযুক্ত মন সুস্থির হয় না, চিত্তচাঞ্চল্য হেতু উচিত মত পরিশ্রম করিয়াও কর্ম্মে, পদে পদে ত্রুটি ঘটে, আর তাহা সুন্দর রূপে সম্পাদন করিতে শক্তি সামর্থ্যে কুলায় না! উদ্যম উৎসাহের ভঙ্গ হইলে, স্পৃহা লোপ পায়, সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষুণ্ণ মনে দুর্ব্বল দেহে

কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না, আপনাকে অধিকতর অকর্ম্মণ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এরূপ অবস্থায় জীবন ধারণ, সংসারের গলগ্রহ বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকে, পদে পদে লাঞ্ছনা, অবমান ও তিরস্কার কল্পনায়—আহার বিহার, নিদ্রা জাগরণে অশান্তির উদ্রেক হয়।

মোহিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের দেখা সাক্ষাতে প্রতিবন্ধক ঘটিলে, সুকুমারী, মোহিনী যাহাতে কোন প্রকারে বিচলিত না হয়, তৎ প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিল। স্নেহ, মমতা হীন শুষ্ক হৃদয়ে প্রণয় ব্যথার সঞ্চার হয় না, ভ্রষ্টা নারী স্বার্থ পরতায় অভিযুক্তা হইয়া হাব ভাবে আশ্রিত পুরুষের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রয়াস পায়, সে পাষাণ প্রাণ কিছুতেই বিগলিত হইবার নহে, মোহন ফাঁদে নাগরকে একবার জড়িত করিতে পারিলেই নিজ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে জানিয়া অসতী, উপপতির উপর প্রাধান্য দেখাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করে এবং ছলে কৌশলে নিঃস্ব করিয়া তুলে, পরিণামে অভাগাকে মনস্তাপে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুচতুরা প্রবীণার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নবীনা মোহিনী, প্রেমিক নগেন্দ্রকে লইয়া কত খেলাই খেলাইয়াছিল। আত্মহারা প্রেমিক নগেন্দ্র, কয়েক মাসেই প্রণয়িনী, মোহিনীর মোহন-পাশে বাঁধা পড়িয়া, তাহারই চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল। এ কারণ, যে দিন সুকুমারীর বাটী হইতে নগেন্দ্র সভ্যতার চির বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে দিন তাহার যে কি কষ্টে কাটিয়াছে, গ্রন্থকার সে দুঃখ কাহিনী বর্ণনে অক্ষম, তবে ভুক্তভোগী পাঠক সে ব্যথায় যে ব্যথিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বরদার সহিত নগেন্দ্রের সৌহৃদ্য বৃদ্ধির পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগ জনিত চিত্ত চাঞ্চল্যে নগেন্দ্র আত্মহারা হইয়াছিলেন, মোহিনীর সহিত মিলিয়া তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু এক্ষণে নগেন্দ্র, মোহিনী বিরহে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কুলটার প্রেমে মজিয়া নগেন্দ্র, সতীর কথা ভুলিয়াছিলেন, অক-

স্মাৎ এরূপ বিচ্ছেদ সংঘটনে তাঁহার শোকসাগর দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল। বধূ-বিয়োগে আত্মীয় স্বজন, নগেন্দ্রের ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছিল, অধুনা অভাগার প্রতি সে সহানুভূতি কে দেখাইবে? নগেন্দ্র মনের আগুনে পুড়িতে লাগিলেন।

একান্ত দুঃখে অভিভূত না হইলে, চিন্তা শক্তির সমধিক বৃদ্ধি হয় না। এরূপ অবস্থায় কোন বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলে, উত্তরোত্তর তাহাতেই তন্ময় হইতে হয়, একাগ্রতা প্রযুক্ত বিষয়ান্তরে আসক্তির সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মন যখন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, অভিলষিত বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে সে স্তম্ভিত হয়। কোন বিষয়ে এক ভাবে অনুরক্ত থাকিলে, সময়ে সূক্ষ্মাসূক্ষ্মের বিচারে তাহার উপকর্ষতা লাভ হয়। এক্ষণে নগেন্দ্রের আশা ভরসা সকলই যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সংসারে তাঁহার সকল দিক বজায় থাকিলেও, একের অভাবে তাঁহার মতি গতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তিনি কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছেন না। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় নগেন্দ্র এতই বিপন্ন যে, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

সময়-স্রোতে মানুষের মতি গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। নগেন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর পরলোক গমন হইতে এ তাবৎ কাল মনস্তাপেই কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছেন; কিছুতেই সে দুঃখের উপশম হয় নাই। মোহিনীর সহিত মিলিয়া কয়েক মাস তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয় শান্তি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কুলটার সংশ্রব-বিমুক্ত হইয়াই তাঁহার চিন্তা-সমুদ্র, পুনরায় উথলিয়া উঠিয়াছিল। চরিত্রবান অবস্থায় নগেন্দ্রের প্রতি যাঁহারা স্নেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, বারাঙ্গনার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অভাগা একে একে তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। বরদা, রমণ প্রভৃতি মোহিনীর

আলাপে যাহারা, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা-রাও তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখে না। নগেন্দ্র আপন মনেই ভাবিতে থাকেন, সে চিন্তার কুল কিনারা কিছুই নির্ণয় হয় না, তথাচ নগেন্দ্রের সে চিন্তার বিরাম নাই। এই ভাবে দিন যাইতেছে, এমন সময়ে একদিন নগেন্দ্রনাথের সদাশিব রায় নামক এক বন্ধু। অযাচিত ভাবে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখা সাক্ষাতে বহুকালের ব্যবধান থাকিলেও সদাশিব, নগেন্দ্রনাথের অনু-ষ্ঠিত কার্য্যাদির সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন, সোৎসাহে স্বেচ্ছায় নগেন্দ্র প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সে হুতাশন তাপে তাঁহার শরীর যে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াছিল, এ সংবাদও সদাশিবের অজ্ঞাত ছিল না।

একান্ত অনুরাগে কেহ কোন বিষয়ে সংযত হইলে, পরিণামে যতই অমঙ্গল ঘটুক না কেন, প্রবোধ বা উপদেশ বাক্যে তাহা হইতে বিরত হই-বার সম্ভাবনা অল্প জানিয়াই সদাশিব, বন্ধুকে সে কার্য্যে বিরত করিবার জন্য আকিঞ্চন করেন নাই। অধিক কি, সে সময়ে সে হিতবাণী নগেন্দ্রের নিকট উপেক্ষিত হইবে, কোন ফলপ্রদ হইবে না, সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি বন্ধুর বিপদে ব্যথিত হইয়াও, তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই; কিন্তু পদে পদে নগেন্দ্রনাথের গতি বিধি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পিশাচিনী মোহিনীর মোহন চক্রভেদ করিয়া নগেন্দ্র উদ্ধার পাইয়াছে, অবৈধ কার্য্যের জন্য বন্ধু অনুতপ্ত হইয়াছে, আপনাকে ধিক্কার দিতেছে, স্বার্থময়ী কুলটার নিগ্রহে, পরিণীতা পতিব্রতার চিন্তায় নগেন্দ্রের হৃদয় নিপী-ড়িত হইতেছে, দেবেন্দ্রের নিকট ইহার সবিশেষ সন্ধান পাইয়াই সদাশিব, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বিকৃত প্রকৃতিগ্রস্ত নগেন্দ্র শোকতাপে এতই অভিভূত যে, হিতাহিত চিন্তায় তিনি এককালে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, অসার ও অকর্ম্মণ্য ভাবে তাঁহার দিন কাটিতেছে, অথচ সময়ে সময়ে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, কি আধি-

তেছেন—আকাশ পাতাল চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও, তাঁহার মীমাংসা হইতেছে না। কি ছিলাম, কি হইলাম—এইরূপ চিন্তা এক একবার তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রলাপ বেগে সে চিন্তা লোপ পাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে নগেন্দ্র বিশেষ বিপন্ন হইয়াছেন। বহু দিনের পর বন্ধুর সহিত বন্ধু দেখা করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু সদাশিব, নগেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। উভয়ের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও প্রকাশ হইল না। নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে, বন্ধুর অশ্রুধারায় বন্ধুর অশ্রু মিশিল, পরস্পরের নয়নাসারের বিরাম নাই, এক ধারা মুছিতে না মুছিতে, অন্য ধারা বিগলিত হইতেছে।

সদাশিবকে নগেন্দ্র দেবতার ন্যায় বলিয়াই জানেন, প্রকৃত পক্ষে সে মহাপুরুষ-চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র নাই। সদাশিব—কর্ত্তব্য পালনে সুখ্যাতি নাই, লঙ্ঘনে অখ্যাতি—এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, সংসার-পথের পথিক হইয়াছেন। এক সময়ে নগেন্দ্র-চরিত্রে সে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। সংসার সমাজ সকল দিকেই নগেন্দ্র, সদাশিবের সমতুল্য না হইলেও, পরিচিত মাত্রেরই নিকট প্রশংসা ভাজন ছিল। সমানে সমানে না হইলে বন্ধুত্ব হয় না, সেই কারণে সদাশিব, নগেন্দ্রকে আপনার ভাবিয়াছিলেন, নগেন্দ্র সহ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্যে সংসার লীলা, সদাশিব তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার অনুষ্ঠানে প্রায় ত্রুটি লক্ষিত হয় না, উত্তরোত্তর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছেন। অন্য পক্ষে নগেন্দ্র তাঁহার মত সংসার-ব্রতে ব্রতী হইলেও, সুদূর ভ্রমণে পদস্খলিত হইয়াছেন, কালের সুদীর্ঘ ব্যবধানে বন্ধু হইতে বহু দূরে, পশ্চাতে পড়িয়া সুগমে দুর্গম বুঝিয়াছেন। উভয়ের একণে ভিন্ন গতি, এক পথের পথিক হইয়া মতি গতিতে দুই জন দুটী স্থান লক্ষ্য করায় উভয়ের ক্রিয়াদিরও

ভেদ দাঁড়াইয়াছে। অভাবে বা সামান্য লাভে একের মন প্রফুল্ল, তাহাতেই অন্যের বদন বিষণ্ণ। নগেন্দ্র বন্ধুর সাক্ষাতে গত ঘটনাবলী স্মৃতিপথে জাগ্রত করিয়া অশ্রু ধারা বর্ষণ করিতেছেন, এ দিকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মনে সদাশিব, বন্ধুর অধোগতিতে ব্যথিত হইয়া সহানুভূতির নয়নাসার নিক্ষেপ করিতেছেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, সদাশিব সাদরে বন্ধুকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "ভাই নগেন্দ্র! সংসার পরীক্ষার ঠাঁই, শিক্ষিত না হইলে, ভাল মন্দ সকল দিক্ না দেখিলে, প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নে কে উত্তর দিতে পারে? উপদেশ লইয়া যে কার্য্য করে, স্বীকার করি, তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পদে পদে যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে, তাহার কার্য্যে সফলতা লাভ অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃত পক্ষে সেই কৃতী।"

নগেন্দ্র বলিল, "সদাশিব! তুমি আমার বন্ধু, জানি তুমি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখ, তাই দেখিতে আসিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধান। তুমি আকাশের পূর্ণচন্দ্র, আর আমি নরকের কীট—"

নগেন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে সদাশিব বলিলেন, "ভাই নগেন্দ্র! তোমায় আমায় কি প্রভেদ আছে? অতীতের কথা বিস্মৃত হও, মায়ার মোহিনী লীলা, সে লীলার খেলায় কত শত বিভীষিকা প্রতি নিয়ত ঘটিতেছে, তুমি আমি মোহের দাস—সে খেলায় পদে পদে লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি দূরে থাকিয়া খেলা দেখিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু এখনও সে শিক্ষা আমার সম্পূর্ণ রূপে লাভ হয় নাই, তুমি খেলায় হারিয়াছ সত্য, কিন্তু সে হারে তোমার যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহা কি তুমি কখন ভুলিতে পারিবে? সেই শিক্ষাই পরীক্ষায় তোমার সহায় হইবে।"

ন। সদাশিব! আর আমায় লজ্জা দিও না, আমি আমার আমিত্ব অনেক দিন ঘুচাইয়াছি। আমি সংসারের কণ্টক, আমার মত মহা-

পাতকী বুঝি জগতে নাই! বিলাসভোগী—ইন্দ্রিয়ের দাস আমি, আপনার পায় আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছি, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

স। নগেন্দ্র! যাহা হইবার—হইয়া গিয়াছে, গত বিষয়ের অনুশোচনায় বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের অবহেলন—মূর্খের কার্য্য। তুমি উতলা হইও না। তুমি আমি যাহা করি, স্থির জানিও—একজন করায়—তবে করি। তোমার আমার সাধ্য কি যে, তাহার দৃষ্টি ব্যতীত কোন কার্য্যে হাত দিই? এখন তাহার প্রতি দৃষ্টিতে—যাহা করিয়াছ, তাহার ন্যায় অন্যায় বুঝিয়া অনুতাপ করিতেছ, সুতরাং তোমার সুসময় নিকটে।

ন। ভাই সদাশিব! সে দিন কি আমার আসিবে? আমি সংসার, সমাজ, আপন, পর, ঘর, বাহির সকলেরই অপ্রিয় হইয়াছি। আমার এখন আমার বলিতে কেহতো নাই।

স। যে সকলের অপ্রিয়—একের সে বড় আদরের। সে আদরের, সে ভালবাসার—প্রতিদান নাই। তুমি আমি সংসারের, জন্য ভালবাসার জন্য, —পাগল। আমিত্ব না থাকিলে কি—জন্য ভালবাসা স্থান পায়! ভাবিয়া দেখ ভাই! এ—জন্য ভালবাসা—কত ক্ষণের জন্য? যাহার ভালবাসা নিত্য, একবার তাহার আদর পাইলে, যাহারা তোমায় আমায় আদর করে নাই, কথায় কথায় অবহেলা করিয়াছে, তাহারাই আবার আদর করিবে, ভালবাসিতে উৎসুক হইবে। তবে সে সোহাগ, ভালবাসা—সাধনে—সময়ে ফলে। ইচ্ছা করিলেই কোন কাজ হয় না, একাগ্র চিত্তে তৎ সাধনে প্রয়াসী হও, তন্ময় হইতে না পারিলে, কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয় না।

ন। ভাই! যদি আমার সেই শক্তিই থাকিবে, তাহা হইলে আজ এত বিপন্ন হইব কেন? আমি মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছি, অন্যে কি করিবে?

স। ভগবৎ কৃপাই—ফলে, যে আপনাকে বিপন্ন মনে করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখে, সতর্ক থাকে, তাঁহার কৃপায় তাহারই হৃদয়ে সে চিন্তার উদয় হয়, সে চিন্তা না আসিলে—চিন্তামণি লাভ হয় কি? তুমি তাঁহাকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছ, অবশ্যই সময়ে তাহাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ভাই! গত বিষয়ের অনুশোচনায় লাভ নাই, সম্মুখে বিস্তৃত সংসার-ক্ষেত্র, পুত্র কন্যার মুখের প্রতি তাকাইয়া সংসার ধর্ম্মে মন দাও, একে একে সকল অভাব পূরণ হইবে।

ন। সদাশিব! তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য, কিন্তু আমি এতই ক্ষীণচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, কি করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

স। ধৈর্য্য অবলম্বন কর, এককালে উতলা হইলে কোন কাজই হয় না। তুমি মূর্খ নহে, লেখা পড়া শিখিয়াছ, হিতাহিত বিচার করিতে সক্ষম। শুদ্ধ কল্পনায় কিছুই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। অবস্থা বিড়ম্বনায় চিত্তবৈকল্য প্রযুক্ত তোমার মন স্থির হইতেছে না। এ ভাবনা—এ উদ্বেগ —কয় দিনের জন্য? বিষয়ী ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলেই অকারণ দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া থাকে, জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। দেহের সহিত আত্মার যতক্ষণ সংস্রব থাকিবে—শ্রম, বিরাম, আহার, বিহার সকলেরই আবশ্যক, একটার অভাব হইলে অন্যটার প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শোক তাপে অভিভূত হইয়া কেন শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছ, অনুষ্ঠিত গর্হিত কার্য্যের ফল ভোগ ভিন্ন যখন তাহার আর কোন প্রতিকার নাই, তখন সে ভাবনা চিন্তায় আর ফল কি?

ন। ভাই! মন বোঝে না। তাই ভাবি, ভাবিয়া কিছুই হইবে না জানিয়াও, আবার ভাবিতে থাকি।

স। তুমি ভাবিত থাক, তাহা আমি জানি। ভাবনায় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কোন ফল হয় না। ভাবার মত ভাবিতে পারিলে, বিশেষ উপকার দর্শে; সে ভাবনায় পরিণামে মঙ্গল সাধিত হয়। এখন তোমার মনের গতি বড়ই চঞ্চল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তোমার মতি গতি ফিরিতেছে—ঘুরিতেছে, এখনও স্থিরতা পাইতেছে না। তুমি সংসারী, সংসার ধর্ম্মে মন দাও, যাহাদের ভরণ পোষণের ভার তোমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখ। নিত্য নিয়মিত কার্য্যে সংযত থাকিয়া অবসর কালে ভাবিবার সময় পাইবে, একাগ্র চিত্তে সে সময়ে যে চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে, নিশ্চয় জানিও—তাহা কখন বিফল হইবে না।

ন। ভাই! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এই বলিলে—ভাবিয়া কোন ফল নাই, আবার বলিতেছ—ভাবনায় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তোমার এ কথার রহস্য আমি ভেদ করিতে অক্ষম।

স। নগেন্দ্র! আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই, তুমি শোকতাপ গ্রস্থ হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়াছিলে, তোমার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইতেছিল না। যাহা হউক কথায় বার্ত্তায় তোমার যে মুখের কথা শুনিলাম, তাহাতেই আমি আনন্দিত হইয়াছি। ভাই! চিন্তায়—চিন্তামণি লাভ হইয়া থাকে, তবে সে চিন্তায় যতক্ষণ অন্য চিন্তা মিশ্রিত থাকে, তত ক্ষণ তাহা অমল ভগবানে নীত হইতে পারে না। সমল চিন্তাকে ভগবৎ চিন্তায় বিশুদ্ধ করা সময় সাপেক্ষ, সংসারে থাকিয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যে আপনার কাজ করিতে পারে, সেই ব্রতী—তাই বলি, এখন সম্মুখে যে কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তারিত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাতে সংযত হও।

ন। সদাশিব! তুমি আমার সবিশেষ জ্ঞাত আছ কি না, জানি না; তবে বর্ত্তমানে আমার সহিত আলাপ রাখিতে বা আমার সংবাদ লইতে কেহ নাই, তুমিই এ সময় আসিয়া দেখা দিয়াছ, যদি আসিয়াছ—আমার

একান্ত অনুরোধ—বিপন্নকে উদ্ধার করিতে হইবে। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, উভয়ের এক মন—এক প্রাণ, তাই এততেও আজ বহুদিনের পর, আবার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিল।

স। নগেন্দ্র! লোকের কখন কি ঘটে, কে বলিতে পারে? সুখ দুঃখের নির্ণয় নাই, তবে তুমি অনুতপ্ত, মনোকষ্টে কালাতিপাত করিতেছ, অবশ্যই ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিবেন। মনের গতি চঞ্চল, বিষয় বিশেষে সংযত না হইলে, মন একটা লইতে অন্যটায় অনুরক্ত হইয়া পড়ে। যদি সে বিষয়ে স্থির সঙ্কল্প না হও, হেথা সেথা উধাও ভাবে মন ফিরিবে—ঘুরিবে, কিন্তু তাহাতে কোন কাজই হইবে না। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমায়, আমার এই অনুরোধ যে, যাহা করিতে বলিব, অবিচলিত চিত্তে তাহা করিবে, আমার কথায় দ্বিধা করিবার তোমার কিছুই নাই।

ন। ভাই! নানা কারণে মতি স্থির রাখিতে পারিতেছি না। এ প্রাণে কত জ্বালা যন্ত্রনা যে সহ্য করিয়াছি, তাহা মুখে বলিবার নহে। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দিনে দেখা দিয়াছ, যাহাতে আবার সংসারী হইতে পারি—সমাজ, সংসার সকল দিক বজায় করিতে পারি, সে বিষয়ে তোমার সহানুভূতিই আমার আশা ভরসা, তুমি যাহা বলিবে, আমার না করিবার কোন কারণ নাই, তবে মনের গতি এতই বিকৃত হইয়াছে যে, ঠিক পারিব কি না—বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি।

স। ভাই! সময়ের গতিতে তুমি কিছু দিনের জন্য আপনহারা হইয়াছিলে, কিন্তু সে ভাব কয় দিনের জন্য? যাহার হৃদয়ে হিতাহিত বিচার শক্তির প্রক্রিয়া এককালে লুপ্ত হয় না, মায়ামোহে জড়িত হইলেও সময়ে সময়ে সে পরিণামের চিন্তা করে। কোন গতিকে সে ব্যক্তি যদি এক বার মন-মোহিনী মায়ার, অনন্তকারার এক কারা হইতে অব্যাহতি লাভ করে, আর কি কখন সে স্বেচ্ছায় সে কারায় প্রবেশ করিতে চাহে? তোমার

অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য অনুতপ্ত বা সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠেকে শেখাই—শেখা। কোন জিনিষের আস্বাদন না লইয়া, তাহা মুখ রোচক কি—না, বুঝিতে পারা যায় না। আগুনের দাহ্ শক্তি আছে—সকলেই জানে, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই আগুনে একবার দগ্ধ হইয়াছে, সে যেমন অগ্নির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, অন্যে তাহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারে না।

ন। আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই. একবার পদ স্খলনে যে অধোগতি ভোগ করিতে হইতেছে, সম্ভবতঃ সজ্ঞানে এরূপ গর্হিত কার্য্যে আর কখন প্রবৃত্ত হইব না। সদাশিব! এখন তোমায় আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, সময়ে সময়ে তোমায় আমায় যেন সাক্ষাৎ হয়, বিপথগামী বন্ধুকে যদি শরণাগত করিতে সাধ হইয়া থাকে, আমার এ কথাটী উপেক্ষা করিও না।

স। তুমি পাগল, তাই এমন কথা বলিতেছ। তোমার এখনও মতি স্থির হয় নাই। আমরা কি তোমায় পর ভাবি? দেখা সাক্ষাতের অভাব হইবে কেন? আমি তোমায় দেখিতে আসিব, তুমি সময়ে সময়ে আমাদের বাটীতে যাইবে। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, আবার আদরের চক্ষে দেখে, তুমি বলিবে—কেহ তোমার সংবাদ লয় না, তোমার সহিত কথা কয় না, তোমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে—সে ভাই ক দিনের জন্য? তুমি মানুষ হইয়া বুদ্ধির দোষে পশুর আচার গ্রহণ করিয়াছিলে, তোমার বন্ধুবান্ধব তাই তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু এখন তুমিতো আর তাহা নাই; যাহারা পূর্ব্বে তোমায় আদর করিয়াছিল, এখন তাহাদের নিকট অনাদৃত হইতেছ বলিয়া দুঃখ করিও না, যখন তোমার মতি গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেখিও —অবিলম্বে তাহারা সকলেই তোমাকে পূর্ব্বভাবে দেখিবে।

উভয়ের এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় বহুক্ষণ কাটিলে, নগেন্দ্রনাথ সদা-

শিবকে তথায় আহারাদির জন্য অনুরোধ করিল। সদাশিব বন্ধুর কথায় দ্বিরুক্তি করিল না।

নগেন্দ্রের পরিবারবর্গ সকলেই সদাশিবকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, অন্য পক্ষে বিপথগামী বন্ধুর উদ্ধার সাধনেই সদাশিব নগেন্দ্রের বাটীতে আসিয়াছেন, এ সময়ে বন্ধু যাহাতে প্রসন্ন থাকেন, তদ্বিষয়ে সদাশিব উদাস হইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় নগেন্দ্রের অনুরোধ সদাশিব যে রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর সহিত নগেন্দ্রের আর সাক্ষাৎ হয় না। স্বার্থসাধন উদ্দেশ্য হইলেও যুবতী, নগেন্দ্রনাথকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিল, জননীর প্ররোচনায় মোহিনী, নগেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছে, অন্য উপপতির উপভোগ্য হইয়াছে। অকস্মাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনে, যুবতী বাহ্যিক দৃশ্যে কোন অসন্তোষের চিহ্ন না দেখাইলেও, নগেন্দ্র বিরহে দারুণ অন্তর্জ্বালায় কষ্ট পাইতেছে। মনের বেদনা, সময়ে সময়ে মুখে প্রকাশ পায়, বিশেষ সতর্কে থাকিলেও তাহা গোপন করা যায় না। যাঁহার অবলম্বনে মোহিনীকে মনসাধে বঞ্চিতা হইতে হইয়াছে, কয়েক দিন মাত্র উপভোগে নিরত থাকিয়াই, তাঁহার সকল সাধ আহ্লাদ শেষ হইয়া গেল। মোহিনীর সহিত আলাপ পরিচয়ে মহেশ্বরের প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিল না। বিলাস ভোগে তিনি আজীবন অভ্যস্ত, বারাঙ্গনার যাবতীয় চাতুরী ছলনাময়ী হাবভাব, তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত ছিল না, এ কারণ মোহিনীর সহিত প্রেমালাপে মহেশ্বর পদে পদে ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন, মনের আবেগে মোহিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন ; প্রণয়িনী পূর্ণ শান্তি প্রদানে অক্ষম বুঝিয়া মহেশ্বরের মন ভাঙ্গিল, এরূপ আমোদ

প্রমোদে বিতৃষ্ণা জন্মিল। অনুরাগের হ্রাস হইলেই আদর যত্নে আর পূর্ব্ব ভাব থাকে না, যে সুখের অন্বেষণে মহেশ্বর, মোহিনী-প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন, সাধ্য সাধনায় তাহার পূরণ হইল না, দেখিয়া—অবিলম্বে মহেশ্বর, মোহিনীকে ত্যাগ করিলেন।

প্রথম আলাপ পরিচয়ে মহেশ্বর যে টাকা কড়ি দিয়াছিলেন, দশ পনের দিনেই প্রেমিকের মনের গতি ভিন্ন ভাবাপন্ন হওয়ায়, মোহিনী বা সুকুমারীকে তাহার অধিক আদায় করিতে হইল না; মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, হয়ত সুকুমারীর অর্থ লালসা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইত; কিন্তু বিধি সে সাধে বাদ সাধিলেন। মহেশ্বর অতৃপ্ত হইলেও, ভদ্রসন্তান, মোহিনীর জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার এক কপর্দ্দকও প্রতি গ্রহণের ইচ্ছা দেখাইলেন না।

নগেন্দ্রের বিদায়ে, মহেশ্বরের আগমনে, এককালে কতকগুলি টাকা হস্ত গত হওয়ায়, সুকুমারী কন্যার অদৃষ্ট ফিরিল জানিয়া—মনে মনে কত সুখী হইয়াছিল, কিন্তু অকালে মহেশ্বর, মোহিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার সকল আশাই ঘুচিয়া গেল। মহেশ্বরের নিকট হইতে বাকী যে টাকা পাইবার কথা ছিল, কিছুই তাহার আদায় হইল না। অনর্থের মূল, অর্থ লইয়া কন্যা ও মাতার মনান্তর ঘটিলমাত্র।

মোহিনী, নগেন্দ্রে আসক্ত ছিল, অর্থের প্রলোভনে রমণী মনের আবেগ মনেই সম্বরণ করিয়া মহেশ্বরে অনুরক্তা হইতে 'চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহার দুরদৃষ্ট ক্রমে সে আশাও পূরিল না; মহেশ্বরের বিদায়ে রমণী অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গে সুকুমারীর সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইল। মাতার ধারণা—কন্যা, মহেশ্বরকে যথাযথ সমাদর করে নাই, নগেন্দ্রে অনুরক্ত থাকায়, নবীন নাগর আদর যত্ন না পাওয়ায় চলিয়া গেল!

মোহিনী অন্তর্জ্বালা আর গোপন রাখিতে পারিল না, সংসারে তাহার

বিতৃষ্ণা দাঁড়াইল। আহার, বিহার, বেশভূষায় কন্যার অনাস্থা দেখিয়া, সুকুমারী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সযত্ন হইলেও, ক্রমে ক্রমে মোহিনীর মনের গতি ভিন্ন পথে ফিরিল, যুবতী একাগ্র চিত্তে ভগবৎ সাধনে উদ্যোগী হইল।

বেশ্যা-তনয়া বেশ্যার প্রতি সকলেরই বিদ্বেষ, সস্নেহ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিতে জগতে কেহ নাই জানিয়াই মোহিনী, চরিত্র সংশোধনে সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইল। স্বপ্নাবস্থায় মৃতপতির বাক্যে মোহিনী, সংসারের ভাব গতি সম্যক বুঝিয়াছে। ইহ জীবনে পর পুরুষের আর মুখাবলোকন করিবে না, কায়িক শ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে যাহাতে তাহার সদ্গতি হইতে পারে, একাগ্র চিত্তে সেই উপায় উদ্ভাবনে তৎপরা হইল।

যে বৃত্তি লইয়া মোহিনী গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, পদে পদে লাঞ্ছনায় সে সুখ সম্ভোগে, তাহার বীতানুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য প্রযুক্ত অভাগিনী কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। এরূপ মনক্ষুণ্ণ অবস্থায়, তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে সংসারে কেহতো নাই! এক সময়ে নগেন্দ্র তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টিতে কিছু দিন মোহিনীর মনের আনন্দে কাটাইয়াছিল, সংসারে ভাল বাসায় স্ত্রী—পুরুষে, পুরুষ—স্ত্রীতে অভেদ হয় বলিয়াই, স্ত্রীর সুখ, দুঃখই —পুরুষের সুখ দুঃখ, পুরুষের সুখ, দুঃখই—স্ত্রীর সুখ দুঃখ রূপে সহানুভূতি প্রকাশ করে। নগেন্দ্র সহবাসে মোহিনী সেই সুখ দুঃখ সম্ভোগে প্রগাঢ় প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, সে মনোমিলনে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু মাতার অর্থ লিপ্সায় মোহিনী, সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছে। যখন সে সুখ গিয়াছে, তখন অর্থগত সুখ সম্ভোগে মোহিনীর আর প্রবৃত্তি নাই, সদনুষ্ঠানে সংযত থাকিয়া যুবতী যাহাতে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে দিন যাপন করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ যত্নবতী হইল। তাহার যৌবন সুলভ

কান্তিই এখন সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজ সজ্জায় সুন্দরী সাজিতে, দিনে দিনে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। সুচিকণ সুদীর্ঘ চিকুর রাজি রমণী মাধুর্য্যের প্রধান সহায়,মোহিনী সে কুন্তল-দামের পারিপট্যে আর লক্ষ্য রাখে না। অযত্নে সে কেশদাম শ্রীহীন বিবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

মোহিনীর এখন মনের গতি ভিন্ন পথে অগ্রসর। মহেশ্বর বিদায়ের অনতিবিলম্বে মোহিনী, তাহার মনের দেবতা নগেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। নিরপরাধী প্রেমিককে অনর্থক নিগ্রহ করা হইয়াছে, এক দিনের জন্যও তিনি তাহার সহিত কোন প্রকার চাতুরী ছলনা করেন নাই, মোহিনীকে প্রসন্না দেখিতে, সুখে রাখিতে সাধ্যমত তাঁহার আগ্রহ যত্ন ছিল, এত সোহাগ অনুরাগেও মোহিনীর নির্দ্দয় নৃশংস ব্যবহারে তাঁহাকে মনক্ষুণ্ন হইতে হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথের সে মনোকষ্ট মোহিনীর অজ্ঞাত নহে, প্রকৃত পক্ষে মোহিনী, তাঁহার এ জ্বালা যন্ত্রনার মূল কারণ। পদে পদে নগেন্দ্রনাথের নিকট অপরাধিনী বলিয়া মোহিনী তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য উৎসুক হইল। এখন রমণীর সে স্বার্থময়ী ভাব আর নাই, জন্য ভালবাসা সে বিস্মৃত হইয়াছে। সে প্রেমভাণে সরল প্রাণে দাগা দিয়াছে, অকারণে মনক্ষুণ্ন করিয়াছে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া মোহিনী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না।

নগেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য মোহিনীর দিন দিন একান্ত আগ্রহ বাড়িতেছে, কিন্তু নগেন্দ্রের কি দর্শন মিলিবে! কি উপায়ে সে প্রেমিক পুরুষের দেখা পাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। ভদ্র লোকের বাটীতে বা পথিমধ্যে ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের সহিত অনায়াসে সাক্ষাৎ করিতে পারে, কিন্তু মোহিনীর সে সাহস কোথায়? সমাজ বন্ধনে মোহিনীর সে পথ কণ্টকাকীর্ণ। লোক লজ্জায়, সমাজ ভয়ে কোন দিকে অগ্রসর হইবার

তাহার অধিকার নাই। এরূপ অবস্থায় রমণী কিরূপে তাহার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে? লোক পরম্পরায় মোহিনী, নগেন্দ্রনাথের গতি বিধি জানিবার জন্য উৎসুক রহিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে নিরাশ অবস্থায় নগেন্দ্রের দিন কাটিতেছে, সংসারে তাঁহার কোন আস্থা নাই, নিভৃতে নির্জ্জনে শূন্য ভাবে শূন্য হইয়া নগেন্দ্র দিনাতিপাত করিতেছেন। নিরাশ প্রাণে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত চিহ্ন পদে পদে অঙ্কিত হইলেও পরক্ষণে তাহা মিলাইয়া যায়। নগেন্দ্রনাথের প্রকৃতি কোমল, কোমল হইলেও বেশ্যা সংসর্গে মনের যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, এখন তাহা আবার পূর্ব্ব ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এখন তিনি লোকের কোন ভাল মন্দেই থাকেন না, কথায় কথায় কোন প্রকার মনোমালিন্যের সূত্রপাতেই চির অভ্যস্থ শিষ্টতা গুণে নগেন্দ্র, তাহা এরূপে গ্রহণ করেন, যে তাহাতে হৃদয়ে সে ভাব স্থায়ী হইতে পায় না। কিন্তু মোহিনীর সে কুটিল ব্যবহারে, তাঁহার হৃদয় এরূপ হইয়াছে যে, সে কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই নগেন্দ্র অশ্রুধারায় ভাসিতে থাকেন, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি বিধানে সচেষ্টিত হইয়াও, আজও নগেন্দ্রের সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ী আসিয়া নগেন্দ্রনাথ, পুত্র কন্যাদিগকে নিকটে বসাইয়া সে মনোভাবের লাঘব সাধনে চেষ্টা পান, এরূপ অনুষ্ঠানে প্রথম প্রথম দুই চারি দিবস তিনি কথঞ্চিৎ মনের তৃপ্তিও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্কের গতি, সব সময়ে সম ভাবে থাকে না, নগেন্দ্র সে পুত্র কন্যা সহ বসিয়া দাঁড়াইয়াও আর তৃপ্তি বোধ করেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মকালে গৃহ

মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা লোকের পক্ষে অসাধ্য ও অসহ্য। ছাদে, প্রাঙ্গণে, যেখানে যাহার সুবিধা, সন্ধ্যা সমাগমে সে সেখানে বিরাম লাভ করে। বিপন্ন নগেন্দ্রনাথ রাত্রির ভোজনান্তে এক দিন ভাগিরথী তীরে বেড়াইতে যাইলেন, কল কল নাদিনী ভাগিরথীর পূর্ণ উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে তাঁহার মন প্রাণ ক্ষণ কালের মধ্যেই পুলকিত হইল। এরূপ বিমলশান্তি উপভোগে নগেন্দ্র প্রফুল্ল হইলেন, তাঁহার মনের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ লাঘব হইল—বুঝিতে পারিলেন, এ কারণ প্রতি সন্ধ্যায় আহারাদির পর নগেন্দ্রনাথ প্রায় গঙ্গাতট ভ্রমণে বিরত হন না। গঙ্গাতীর সাধারণের যাতায়াতের স্থান হইলেও, নির্জ্জনতাপ্রিয় নগেন্দ্রনাথ এমন একটী নিভৃত স্থান সন্ধান করিয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি সেখানে জল স্থল সকলই দেখিতে পান, অথচ সেখানে অন্যের গতিবিধি না থাকায়, তাঁহার চিন্তার কোন ব্যাঘাত হয় না। নগেন্দ্রনাথ তরঙ্গিনীর তরঙ্গে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার মনে চিন্তাস্রোতে ভাসিতে থাকেন।

এক দিন নগেন্দ্র এইরূপ ভাবে বসিয়া আছেন, অকস্মাৎ মোহিনী তাঁহার সম্মুখে। রমণী দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র নগেন্দ্র, বারেক শিহরিয়া উঠিলেন, পরক্ষণে শূন্য মনে বিনা বাক্য ব্যয়ে এক দৃষ্টেই কেবল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বিচ্ছেদের পর প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়ের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। যে দারুণ মনোভাব নিবারণ জন্য নগেন্দ্রনাথ আজ নিভৃতে—ভাগিরথী তীরে, সেই দারুণ উদ্বেগেই মোহিনী আজ সুকুমারীর অপেক্ষা না রাখিয়াই, একাকিনী নগেন্দ্র সমীপে উপনীত। নগেন্দ্রের সে বিরহ কাতর মূর্ত্তি দর্শনে মোহিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। মনের আবেগে নগেন্দ্রের চরণতলে এক কালে লুটাইয়া পড়িল, চক্ষুজলে ক্ষমা ভিক্ষায় বলিল, "নগেন্দ্র! সে বহুদিন—একদিন সকাতরে তোমার প্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, বহু সাধ্য সাধনায়

তুমি আমার হইয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার হইতে পারি নাই। পারি নাই বলিয়া—পদে পদে তোমার নিকট আমি অপরাধিনী, আমার জন্যই তোমার এ যন্ত্রনা। এ যন্ত্রনা—কি যন্ত্রনা, এখন তাহা জানিতেছি। জানিতেছি বলিয়াই, দেখিতে প্রাণ কাঁদিলেও আর এ মুখ তোমায় দেখাইব না। যে যন্ত্রনা তোমায় দিয়াছি, সেই যন্ত্রনাই হৃদয়ে পুষিয়া দেখিব—তোমার সে যন্ত্রনা—কি যন্ত্রনা। তবে তুমি উদার, সরল, ভদ্র বংশীয়—আমি বেশ্যাপুত্রী, যদি তুমি নিজ মহত্বে”—

মোহিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে, নগেন্দ্র তাহাকে সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, “মোহিনি! গত ঘটনাবলী ভুলিয়া যাও, ভগবানই সুখ দুঃখের মূল, তুমি আমি নিমিত্তের ভাগীমাত্র। যে কাঁদায়, সেই হাসায়। হাসিবার দিনে হাসিয়াছি, কাঁদিবার দিন আসিয়াছে—না কাঁদিব কেন? তোমার উপর আমার—আমার উপর তোমার—কি অভিমান? মোহিনি! ভগবান করুন, তুমি রাজরাজেশ্বরী হও, স্বর্ণাট্টালিকায় বাস কর, মনের সুখে থাক তোমায় ভালবাসিতাম, 'এখনও যেন তোমায় ভালবাসিতে পারি, তোমার মঙ্গলে যেন আমি সুখী হই।”

মোহিনী বলিল, “কি কহিলে নগেন্দ্র! আজ আমি যে, সে সুখের আশায় তোমার নিকট আসি নাই। সে সুখের আশা যে আর আমি করিতে পারি না; যাহা লম্পট লম্পটীর ঘটে না—ঘটিতে পারে না, যখন তাহা হাতে পাইয়াও অনাদরে ফেলিয়াছি, তখন তাহা আবার লইতে গেলেও যে, সে আর দাঁড়াইবে না। ধন দৌলতে যে—তাহা নাই, ধন দৌলত যে, তাহার সহায় মাত্র। তোমার নিকট অপরাধিনী হইয়া এ পৃথিবীতে আর আমার সে সুখ ঘটিবে না। বিধতা ঘটাইলেও যখন তাহার আদর বুঝি নাই, আদরে—অনাদরে ব্যথিত করিয়াছি, তখন সেই ব্যথার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, নিজেই এ জনমে সে ব্যথা ভোগ করিব, তাহাকে আর এ মলিন স্পর্শে কলুষিত হইতে

দিব না, তাই বলিতেছি—এ জনমে, আর এ ভাগ্যে—সে সুখ ঘটিবে না। কোন গতিকে এ পাপের দেহ শেষ হইলেই প্রাণ জুড়ায়। আমি পদে পদে অপরাধিনী, তোমার কৃপা ভিন্ন আমারতো মুক্তি নাই। তাই আমার শেষ প্রার্থনা—বঞ্চনা করিবেন না, যখন এক দিন দাসীকে হৃদয়ে অধিকার দিয়াছিলেন, স্থান দিয়াছিলেন, তখন আজ চরণ স্পর্শে অধিকার না পাইব কেন? পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, ক্ষমার অযোগ্য হইলেও দাসী—সেই ক্ষমার জন্য উপস্থিত।

ন। মোহিনি! আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তোমার কোন দোষ নাই, অনেক বিষয়েই আমি বরঞ্চ তোমার নিকট অপরাধী, তুমি আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিও।

মো। নগেন্দ্র! সংসারের সকল সাধ আহ্লাদ আমার শেষ হইয়াছে, এ কথা আর এক দিনও বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে মোহিনী মরিয়াছে। সে মরিয়াও আমায় ছাড়ে নাই, সেজন্য এ নরকপুরে, আমায় নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে আর সে প্রবৃত্তি নাই। সে তোমার সহিত বিস্তর চাতুরী ছলনা করিয়াছে, সে সকল কথা যতই মনে হইতেছে, আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। জানি আমি—নরকেও আমার ঠাঁই হইবে না, তথাচ আমার এই প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ কর—যেন জীবনের শেষ ভাগে নিজের দিন, নিজেই দেখিয়া লইতে পারি। তুমি না তাকাইলে, কৃপা না করিলে, আমারতো সে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কিন্তু—আবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যদি মানুষ মরিয়া জন্মে, জন্মিয়া যদি এ সংসারে আবার কাহাকেও ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার পার্থিব গুরু স্বামী, দেবতার রূপেই তোমাকে পাই, অন্যেতো আর এ চিত্ত সুখী হইবে না।

ন। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যখন তোমার মতি গতি ফিরিয়াছে, কামনা অপূরণ থাকিবে কেন?

উদ্বেলিত চিত্তে মোহিনী, নগেন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাতে কথাবার্ত্তায় রমণী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কয়েক দিবস তাহাকে নগেন্দ্রের সাক্ষাৎ জন্য বিশেষ চিন্তিত ভাবে থাকিতে হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের কখন কোথায় অবস্থিতি, সে সবিশেষ তত্ত্ব রাখিয়াছিল ; কিন্তু কিছুতেই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, অবশেষে এক প্রবীণার সহায়তায় গঙ্গাতীরে আসিলে, তাহার সহিত নগেন্দ্রের এই সাক্ষাৎ। পরস্পর দেখা সাক্ষাতে উভয়েরই মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনুরাগ আসক্তি ও ভালবাসা কেহই কাহাকে, না দেখাইলেও হৃদয় ভাব সম্যক্ রূপে দুই জনেই বুঝিতে পারিল, কিন্তু বাক্যে উভয়েই উভয়ের নিকট অপ্রকাশ রাখিল।

বহু কথাবার্ত্তার পর মোহিনী, নগেন্দ্রনাথের পদ ধূলি গ্রহণান্তর বিদায় হইল। প্রেমিক পুরুষ নগেন্দ্রনাথ প্রণয়িনীকে বিদায় দিয়া তাহারই কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন—কি দেখিলাম! যে মোহিনীর সাক্ষাৎ জন্য ব্যাকুল চিত্তে কত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়াছি, যাহার জন্য সংসার সমাজ কোন দিকে ফিরিয়া তাকাই নাই, যে আমার মন প্রাণ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াও আমাকে পদে পদে বঞ্চনা করিয়াছিল, এ কি—সেই মোহিনী! যদি সেই মোহিনীই হয়, তবে আমি কি—সেই আমি, সেই নগেন্দ্র! দেখিলাম—সে মোহিনী নাই, সে নগেন্দ্রও নাই, যাহা আছে সে কেবল স্মরণাবশেষ কলের পুতুল খাড়া মাত্র। কলের পুতুল ভাবিয়াছে, তখন ভালবাসে নাই, এখন ভালবাসা বুঝিয়াছে—ভালবাসে ; কলের পুতুল ভাবিতেছে, তখন ভালবাসিত—এখন ভালবাসে না, তাহা নহে, যদি তাহা হইত না—সে ভাল বাসিত, তবে সেই মোহিনী আজ সম্মুখে কেন? যদি তাহা না হইত—না ভালবাসে, তবে আজও মোহিনীর সুখে সুখী কেন? ধন্য ভগবন! তোমার লীলা—তুমিই বুঝিতে পার, আমরা মানব, বুঝিবার সে শক্তি কই! তবে এই বুঝি—জগৎ প্রেমের, জগৎ ভালবাসার—এই

পরিণাম! এই পরিণাম কোথাও মনের দ্বারা, কোথাও দেহের দ্বারায় প্রকাশ মাত্র। মনের স্বার্থপরতায় সে প্রেম মলিন দেখায়, দেহের বিচ্ছেদে সে প্রেম অলীক হয়, যে প্রেম এক দিন মলিন হয়—অলীক হয়, সে প্রেম—প্রেমই নহে।

এইরূপ ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে নগেন্দ্রনাথের দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে মনের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মোহিনীর আবির্ভাবে তাঁহার সে চিন্তা-গতি ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছিল, এ চিন্তায় সুদীর্ঘ কাল এখানে বসিয়া থাকিয়া মনের শান্তি হইবার নহে, বুঝিয়া নগেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় প্রেমিক পুরুষ প্রণয়িনী সহ মিলিত হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, এখন আর সে সুখ ঘটে না; চিত্ত বিকারে নগেন্দ্র, মোহিনীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, রমণীর কথাবার্ত্তায় তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত শান্তিলাভ করিয়াছিল, প্রণয়িনী সহ বিচ্ছেদ হওয়ায় নগেন্দ্র, পুনরায় বিচঞ্চল হইয়ছিলেন। মায়াবিনী মোহিনীর ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নগেন্দ্র আপন হারা হইয়াছিলেন, তাহাকে সংসারের সর্ব্বস্ব জানিয়াছিলেন, পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ রহিত হওয়াতেই নগেন্দ্র আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু চিত্ত সংযমে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। নূতন শোকে বিহ্বল হইয়া নগেন্দ্রের দিন কাটিতেছে। অশান্ত হৃদয়ে শান্তি সঞ্চারের অনতিবিলম্বে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটনে নগেন্দ্রের হৃদয় অধিকতর বিচলিত হওয়ায়, চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার সহ-

ধর্ম্মিণীর কথা স্মৃতিপথে পুনরায় জাগ্রত হইল। মোহিনী প্রেমে মজিয়া পতি-প্রাণার কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ভগ্ন মনোরথে আশা ভঙ্গে সাধ্বী-সতীর জন্য শোকোচ্ছ্বাসে নগেন্দ্র অধীর হইলেন।

প্রিয়তমাকে জন্মের মত বিদায় দিয়া নগেন্দ্রের চিত্তগতি বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, কোন বিষয়ে নিগূঢ় চিন্তায় সংযত হইতে তাঁহার শক্তি কুলা-ইত না, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নগেন্দ্র প্রয়াসী হইলেও, চিত্ত চাঞ্চল্য প্রযুক্ত দিনে দিনে তাঁহার সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইতেছিল। আশামরিচীকায়, মোহিনীকে প্রেম শান্তিবারি ভ্রমে, তিনি আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, পরিজনবর্গের পরি-মিত ব্যয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, সাধ্যমত মোহিনীর মনোরঞ্জনে কোন অংশেই ত্রুটি করেন নাই, এত সাধ্য সাধনায়ও রমণী তাঁহার সরল প্রাণে আঘাত করিয়াছে, প্রেমিকার চিত্তবিনোদনে তিনি যে, প্রাণ পাত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদানে এইরূপ উপেক্ষিত হইলেন। উদ্বেলিত চিত্তে সময়ে সময়ে নগেন্দ্র, মোহিনীর সকল কথাই মনে মনে আন্দোলন করিতেন। পাপ স্রোতে ভাসিয়া নগেন্দ্র কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, পরিণামে তাঁহাকে তজ্জন্যই এরূপ মনক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার প্রতি কে আর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবে? কিন্তু দেবেন্দ্র, সদাশিবের সহবাসে এখন নগেন্দ্র অনেকটা প্রকৃতস্থ। সময়ে চিন্তায় উদ্বেলিত হইলেও, সে চিন্তা তাঁহাকে আর ডুবাইতে পারে না। তিনি মোহিনীর বিদায় মূর্ত্তি যতই চিন্তা করিতে থাকেন, ততই তাঁহার ভগবানে ভক্তি দৃঢ় হয়। মনে মনে বলেন, ভগবন! তুমি পরম দয়াল, মঙ্গলময়! আজ তোমার মঙ্গলময় স্বরূপেই মোহিনীর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিতেছি। এখন মোহিনী আমায় চাহে না, আমিও মোহিনীকে চাহি না, কিন্তু এখনও মোহিনী আমার মঙ্গল চাহে, আমিও মোহিনীর মঙ্গল চাই। তোমার কৃপায় এরূপ না হইলে হৃদয় মঙ্গলময় হয় কই? আজ মোহিনী আমার শত্রুও নহে—মিত্রও নহে, আমি ও মোহিনীর শত্রুও নহি—মিত্রও

নহি, কিন্তু কি জানি কেন—সে আমার জন্য কাঁদে, আমি তাহার জন্য কাঁদি।

মোহিনীর সহিত মিলন কালে নগেন্দ্র প্রতি রাত্রেই বাটীর বাহির হইতেন, সে সম্বন্ধ না থাকায় এক্ষণে কার্য্যস্থান হইতে বাটী আসিয়া নগেন্দ্র শয়ন গৃহেই পুত্র দুইটীকে লইয়া বিশ্রাম করেন। শ্রীস চন্দ্র কনিষ্ঠ সহ, পিতৃ সমক্ষে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে থাকে, নগেন্দ্র তাহাদের অধ্যয়নে সহায়তায় অন্যমনস্ক থাকেন। তাহাতে নগেন্দ্র কিছুক্ষণ শান্তি ভোগ করেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই নগেন্দ্রের সুনিদ্রা হইত না, মোহিনীর সহবাসে তিনি সে যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, প্রণয়িনীর সহিত বিচ্ছেদ হওয়ায়, পুনরায় নগেন্দ্রের শরীর অনিদ্রায় অবসন্ন হইতে লাগিল, চিন্তায় শরীর গতি এরূপ দেখিয়া শ্রীস চন্দ্র এক দিন ব্যাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! দিন দিন আপনার শরীর খারাপ দেখাইতেছে, আপনার মুখের প্রতি তাকাইয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, এ অবস্থায় আপনি অসুস্থ হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?" তদুত্তরে নগেন্দ্র বলিলেন, "না বাবা! আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে, কোন প্রকার অসুখ নাই। ভগবানের নিকট তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমরা সুখে থাকিলেই আমি সুখী!"

শ্রীস। বাবা! যাতে আমরা ভাবিত না হই, এ জন্য তুমি এমন কথা বলিতেছ। তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছ না, কিন্তু তোমার মুখের পানে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়, তুমি অসুখী রহিয়াছ।

পুত্রের সহানুভূতি সূচক বাক্যে, নগেন্দ্রনাথের চক্ষে জল আসিল। প্রাণেশ্বরীর প্রিয় নিদর্শন শ্রীস চন্দ্রের কথায় নগেন্দ্রনাথ তদ্দণ্ডে প্রেয়সীর প্রেমমূর্ত্তি হৃদয়দর্পণে প্রতিভাত দেখিলেন, শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রাণ

ব্যাকুল হইল, মনের উদ্বেগ মুখে প্রকাশ পাইলেও, অতি সতর্কে সে ভাব গোপন করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, "না আমার কোন অসুখ নাই, তুমি ছেলে মানুষ, এ বেলা আহার করি নাই, সম্ভবতঃ তাহাতেই মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে। তোমরা ভাবিতেছ—আমি মনোকষ্টে আছি, সোণার চাঁদ! যখন তোমরা আমার রহিয়াছ, আমার অভাব কিসের যে, দুঃখ পাইব?"

পিতার সে মূর্ত্তি দর্শনে—তাঁহার কথায় শ্রীস চন্দ্র দ্বিরুক্তি করিল না, সুকুমার মতি বালক বুঝিল, মাতার অবর্ত্তমানে—তাঁহার কথা স্মরণে—পিতা এরূপ ভাবাপন্ন হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের হৃদয়ে সংসারের ভাল মন্দ বিচারের শক্তি না থাকিলেও, গর্ভ্তধারিণীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, এ জ্ঞান স্বতঃই তাহার হৃদয়ে জন্মিল, তাহার নেত্র দ্বয় বারিধারায় পূর্ণ হইল। পিতাকে সান্ত্বনা করিতে নিজেই শ্রীস চন্দ্র রোদন করিল। নগেন্দ্র বুঝিলেন যে, শ্রীস চন্দ্র জননী শোকে বিহ্বল হইয়াই এরূপ রোদন করিতেছে, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশেই পুত্রের এ ভাব দাঁড়াইয়াছে, এ কারণ বিষয়ান্তরের আলোচনায়, কথাবার্ত্তায় তিনি বালকের হৃদয়বেগ সম্বরণ করিলেন।

শ্রীস চন্দ্র পুনরায় পাঠে মনোযোগ দিল, সতীশ এতক্ষণ ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া প্রথম ভাগ পুস্তিকা খানি সম্মুখে খুলিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়াছিল, সময়ে সময়ে তন্দ্রাগত হইয়া ঢুলিতেছিল। নগেন্দ্রের সহিত শ্রীস চন্দ্রের কথোপকথনে সে নিদ্রায় নিমগ্ন হইল, পুত্রকে নিদ্রিত জানিয়া পিতা সযত্নে তাহাকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শায়িত করাইয়া স্বয়ং তাহার পার্শ্বভাগে শয়ন করিলেন। শ্রীস চন্দ্র দৈনিক পাঠ সমাপনান্তে প্রদীপটি নির্ব্বাপিত করিয়া যথাস্থানে ভ্রাতার অপর পার্শ্বে শয়ন করিল। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইয়াছিলেন, শয্যা গ্রহণের অনতিবিলম্বে শ্রীস চন্দ্র নিদ্রায় অভিভূত হইল, গৃহে সাড়া শব্দ কিছুই রহিল না।

অধিক রাত্রে নিদ্রা যাওয়া নগেন্দ্রনাথের চির অভ্যাস। বাল্যে পাঠাধ্যয়নে

শয়নে বিলম্ব হইত, সংসারী হইয়া বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় শয্যা গ্রহণে সুদীর্ঘ সাবকাশ ঘটিত না। স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার কাজকর্ম্ম কতক শিথিল হইয়াছিল, বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার সে অভ্যাসের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, প্রিয়তমার অবর্ত্তমানে, মোহিনী অবলম্বনে রাত্রির সুদীর্ঘ সময় নগেন্দ্রের আমোদ প্রমোদে যাপিত হইত, বহু দিনের অভ্যাসে রাত্রি জাগরণে নগেন্দ্র কোন কষ্ট বোধ করিতেন না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক দিন তাঁহার সে নিয়মের লঙ্ঘন হইতেছে, এক এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া পুত্র দুইটীকে লইয়া নগেন্দ্র পড়াইতে বসেন, শারীরিক অবসন্নতা প্রযুক্ত সেখানেই ঘুমাইয়া পড়েন, তাই আজ কনিষ্ঠ পুত্র সহ শয্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই নগেন্দ্র নিদ্রিত হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, অর্দ্ধ জগৎ ঘুমাইতেছে, সাড়া নাই, শব্দ নাই, নীরব নিস্তব্ধ ;—নগেন্দ্র নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন ;—

যেন তিনি মোহিনীর বাটীতে, মোহিনী তাঁহার সম্মুখে, প্রাণাধিক শান্ত তাঁহার বামে বসিয়া মৃদু হাস্যে তাঁহার প্রতি একাগ্র চিত্তে দৃষ্টি করিয়া আছেন, আর তিনি মোহিনীকে বলিতেছেন ;—মোহিনি! সে দিন তুমি আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলে, তাই আজ আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলাম, কেন আসিলাম—শুনিবে? যেজন্য তুমি আমায় ভালবাসিয়াছিলে, যেজন্য আমি তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম, এখন তোমাতে বা আমাতে তাহা নাই। সে জন্য—সে জন্য ভালবাসাও আর নাই। নাই বলিয়া যে আজ তুমি আমায় ভালবাস না, আমি তোমায় ভালবাসি না, তাহা নহে। তুমি যাহার অংশ, আমিও তাহারই অংশ, অংশীর প্রতি

দৃষ্টিতে, আমার তোমার, তোমার আমার সম্বন্ধ নিত্য। অংশ লইয়াই অংশী পূর্ণ,আমি অংশ—অংশীকে পূর্ণ দেখিতে—তোমাকেও দেখি, ভালবাসিতে—তোমাকেও ভালবাসি। তুমি অংশ, অংশীকে পূর্ণ দেখিতে—আমাকেও দেখ, ভালবাসিতে আমাকেও ভালবাস, এই ভালবাসাই নিত্য, সেই নিত্য ভাল বাসায় আবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তুমিও যাহাকে ভালবাস—আমিও তাহাকেই ভালবাসি, তাহার দিকে তাকাইলে, তুমি আমি এক হইয়া যাই, স্বার্থপরতায় তাহার উদয় হয় না, তুমি আমি দুই হইয়া পড়ি; স্বার্থে বিরোধ ঘটে। ঘটিয়াছিল বলিয়াই, তুমি আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় গিয়াছিলাম, স্বার্থ ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ—তোমার রূপে শান্তির রূপ——শান্তির রূপে তোমার রূপ এক দেখিতেছি, সতী অসতী স্বার্থ রূপে ভিন্ন, নিস্বার্থে অভেদ—এক রূপ, তাই শান্তিকে, তোমাকে—তোমাকে, শান্তিকে যেন আজ এক দেখিতেছি, কিন্তু এ রূপতো সাধারণ স্বার্থ চক্ষু-দৃষ্টিতে ধরিতে পারিবে না, তোমার মহিমা গাহিবে না। সে দিন গিয়াছে—যে দিন মনুষ্য নিস্বার্থ ভালবাসার মহিমায়, তাহার পূর্ব্ব জন্ম ভালবাসা মূর্ত্তি ভুলিত, ভুলিয়া অহল্যা পাষাণীর নিস্বার্থ প্রেম মূর্ত্তিকে সতী বলিতে দ্বিধা করিত না। সে দিন নাই বলিয়া এ দিনে তুমি শান্তির আসনে না বসিতে পাইলেও, এ দিন ফুরাইলে, শান্তিতে তোমাতে প্রভেদ থাকিবে না। আমাতে, তোমার স্বামীতেও প্রভেদ থাকিবে না। তাঁহাতে তোমাতে, আমাতে শান্তিতেও কোন প্রভেদ থাকিবে না। তোমাতে তাঁহাতে, শান্তিতে আমাতে সেই এক প্রেম স্বরূপের প্রেমেরই পূজা করিব—প্রসঙ্গ তুলিব, তাই শান্তি তোমায় আমায় সে সুসংবাদ দিতে আসিয়াছে, আমার হইয়া আজ শান্তি তোমায় আদর করিতে আসিয়াছে, শান্তির আদরই আমার আদর, তোমার আদরই তাঁহার আদর।

তখন মোহিনী শান্তিকে আলিঙ্গন করিল, সে আলিঙ্গনে নগেন্দ্র, শান্তিকে

সম্মুখে লইয়া যখন আলিঙ্গন করিলেন, দেখিলেন সে আলিঙ্গনে মোহিনী শান্তিকে না দেখিয়া নগেন্দ্র ডাকিলেন, শান্ত! তখন নগেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নগেন্দ্রনাথের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে শান্ত, মোহিনী অদৃশ্য হইলেন। শূন্য প্রাণে নগেন্দ্রনাথ প্রেয়সীর জন্য কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে হা হতাশ, বিলাপ ধ্বনি সকলই বৃথা হইল। পুত্র দুইটী তখনও গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, গৃহের দ্বার অর্গলে বদ্ধ, নীরব নিস্পন্দে নগেন্দ্র মনের আবেগে কতই আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। যে মোহিনী প্রেমে নগেন্দ্র আত্মহারা হইয়াছিলেন, সংসার সমাজ সকল দিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কয়েক দিবস তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ স্থগিত হওয়ায়, সংসারের প্রতি তাঁহার আনুরক্তির অভাব হইয়াছিল, দ্বিতীয় স্বপ্নে সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাতে, কথাবার্ত্তায় তিনি কতকটা চিত্ত সংযমে উদ্যোগী হইলেন!

স্বপ্ন দেখিয়া নগেন্দ্রের যে নিদ্রা দূর হইয়াছিল, কিছুতেই সে নিদ্রা আর আসিল না। বহুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া নগেন্দ্র শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর অপেক্ষায় শয্যায় শায়িত রহিলেন, তাঁহার শান্তিহারা প্রাণে উত্তরোত্তর অশান্তিরই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীর হইতে মোহিনী, নগেন্দ্রের নিকট শেষ বিদায় লইয়া আর বাটীর অভিমুখে যাইল না, চিত্ত চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাহার রঙ্গিণী নাম্নী পিসী মাতার বাটীতে উপস্থিত হইল। রঙ্গিণী এখন দশ টাকা সংস্থান করিয়াছে, বেশ্যা সমাজে তাহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছে, সুকুমারীর সহিত আলাপ পরিচয় থাকায়; তাহাকে ননদিনী বলিয়া সম্ভাষণ করিত, সেই সম্পর্কে মোহিনী—রঙ্গিণীর ভ্রাতষ্পুত্রী—পিসীর সাক্ষাতে আসিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাতে, সহানুভূতিতে ও প্রবোধ বাক্যে চিত্তবৈকল্যের কথঞ্চিৎ নিবারণ হইবার সম্ভাবনায়, মোহিনী প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার উদ্দেশ্যেই তথায় আসিয়াছিল। দুই এক কথায় মোহিনী জানিল যে, রঙ্গিণী দাস দাসী সহ পশ্চিম যাত্রা করিতেছে। কয়েক দিবস যাবৎ মোহিনীর মন এতই বিকৃত হইয়াছে যে, কিছুতেই সে স্থির হইতে পারিতেছে না, সংসারের প্রতি তাহার এরূপ বিতৃষ্ণা দাঁড়াইয়াছে যে, আত্মীয় পরিজনের মুখের প্রতি তাকাইতেও তাহার যেন ইচ্ছা হয় না, এরূপ অবস্থায় গৃহবাসে উত্তরোত্তর চিত্ত বিকারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রঙ্গিণী যখন তীর্থ করিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গিনী হইলে, দেবাদি দর্শনে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; সুযোগ বুঝিয়া মোহিনী, রঙ্গিণীকে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সুকুমারীর সহিত মোহিনীর কথাপ্রসঙ্গে মনান্তর হইয়াছে, এ সংবাদ রঙ্গিণীর অজ্ঞাত ছিল না, মোহিনীর প্রস্তাবে রঙ্গিণী সম্মত হইল। যথাসময়ে সুকুমারীকে সংবাদ দিয়া তীর্থ যাত্রায় তাহারা বাহির হইল।

সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গিণী গয়াধামে উপস্থিত হইল, ৺গয়াসুরের পূজা দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে এক গয়ালী, মোহিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল, দুরভিসন্ধির উত্তেজনায় লম্পট তাহা-

দের সঙ্গ লইয়াছে জানিয়া, রঙ্গিণী, মোহিনীকে আপনার কাছে কাছে লইয়া চলিতে লাগিল। দুরাচারী গয়ালী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, সে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য রাজপথেই কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল; তাহার কথায় রঙ্গিণী বা মোহিনী দ্বিরুক্তি করিল না। তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়া বিদেশ বিভূমে একটা গোলযোগ বাধিলে, লাঞ্ছনা অপমানের সীমা থাকে না, অধিকন্তু অনেক সময়ে অধিকতর নিগ্রহিত হইতে হয়, দেশের লোকে স্বদেশীয় জন্য মিথ্যা কথা কহিতে বা কোন একটা অন্যায় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, এরূপ অবস্থায় নিরুত্তর ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় নাই, দ্রুতপদ বিক্ষেপে অবিলম্বে তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিল। নর-পিশাচের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, রমণীদ্বয়ের কোন প্রকার আনুরক্তি জানিতে না পাইয়া, সে অধিকতর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং যে কোন প্রকারে হউক তাহার অভিসন্ধি পূরণে উদ্যোগী হইল। দুরাত্মার মনে যখন যে কল্পনার আবির্ভাব হয়, ছলে বলে কৌশলে তাহা সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। রঙ্গিণী বাসায় আসিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে দিনমানে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তীর্থ স্থানের দেনা পাওনা সমস্তই শোধ করিয়া দিয়া সে স্থান হইতে তাহারা প্রস্থান করিল। দুরাত্মার মনের আশা মনেই মিলাইল।

গয়া হইতে রঙ্গিণী কাশীধামে যাত্রা করিল। মোহিনী তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে, এক দিন সন্ধ্যার সময় ৺বিশ্বেশ্বর দেবের আরতী দেখিতে মোহিনী তাহার পিসী মাতার সহিত গিয়া দেখিল, মন্দিরে সকলেই একাগ্র চিত্তে দেবদেবের উদ্দেশে ভক্তি উন্মুখ, কেহ নয়ন মুদিয়া ধ্যানে সংযত রহিয়াছে, কেহ বা সুললিত ছন্দে মহাদেবের স্তোত্র পাঠ করিতেছে। মোহিনী বেশ্যা হইলেও, তাহার মতি গতি এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পাপী তাপী সক-

লেরই ভগবানের নাম লইবার অধিকার আছে, দুঃখিনী মোহিনী এক মনে একাগ্র চিত্তে বিশ্বনাথের উপাসনায় সংযত হইল। সে ধ্যানে, সে চিন্তায় তাহার পার্থিব সকল সম্বন্ধ যেন রহিত হইল—ভোগী, যোগী ভাবে প্রতিভাত হইল।

পাপমতির ধর্ম্মাধর্ম্মে লক্ষ্য থাকে না, আপনার মনোরথ সফল হইলেই তাহার আনন্দ, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিবারও তাহার সুযোগ হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মোহিনী যে সময়ে বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে সংযত রহিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার গাত্রে হাত দিল, হস্ত স্পর্শে যুবতী শিহরিয়া উঠিল। স্ত্রী, পুরুষের জনতায় সে সময়ে মন্দির পূর্ণ ছিল, এ দৃশ্য লোকের অলক্ষ্য হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারি জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহারা ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে অত্যাচারীর প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিল। মোহিনী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। মোহিনীর প্রতি এরূপ অত্যাচার দৃষ্টে রঙ্গিণী মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

কাশীধামে কয়েক দিবস সাবধানে বাস করিয়া, রঙ্গিণী প্রয়াগ যাত্রা করিল। মোহিনী প্রয়াগ তীর্থে আসিয়া রমণীয় স্বভাব সৌন্দর্য্য কুন্তল-দামের উচ্ছেদ করিল, রঙ্গিণী তাহাকে মস্তক মুণ্ডনে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু যুবতীর দেহের প্রতি তখন ধিক্কার দাঁড়াইয়াছে, রূপের গর্ব্ব যাহাতে চির দিনের জন্য খর্ব্ব হইয়া যায়, মোহিনীর তাহাই একান্ত ইচ্ছা, এ কারণ বহু বাদানুবাদে সাধ্য সাধনায় ভ্রাতষ্পুত্রী, পিসী মাতার উপর প্রাধান্য লাভ করিল। যৌবনে যোগিনী সাজিয়া মোহিনী ধর্ম্ম কর্ম্মে যাহাতে উন্নতি সাধন করিতে পারে, যথাশক্তি তাহারাই চেষ্টা পাইতে লাগিল।

প্রয়াগ তীর্থ হইতে দলে বলে রঙ্গিণী বৃন্দাবন ধামে চলিল। বন ভ্রমণ

না করিলে, বৃন্দাবন তীর্থ পর্য্যটনে সাফল্য লাভ হয় না, ত্রিরাত্রি বৃন্দাবন বাসে দেবদেবীর পূজা ও দর্শন করিয়া, বন ভ্রমণের উদ্যোগ হইল। যথাক্রমে কয়েক দিন এ বন হইতে অন্য বনে গমনে, পথিমধ্যে তাহাদের কোন বিপত্তি ঘটিল না, পরিণামে তাহারা গহন কুঞ্জে প্রবেশ করিল। অসংখ্য যাত্রী একত্র চলিয়াছে, কোথায় যাইতেছে, তাহার সন্ধান তাহাদের অনেকেই জানে না। কেতায় কেতায় লোক চলিয়াছে, স্থানীয় পথ-প্রদর্শক এক মাত্র পাণ্ডা। যে পাণ্ডার যত গুলি যাত্রী, সে তাহাদেরই তত্ত্বাবধান করিয়া লইয়া যাইতেছে।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রী দলের স্থানে স্থানে ছাউনি পড়িল। সারা দিন পথ শ্রমে সকলেই ক্লান্ত, আহারাদি কাহারও হয় নাই, রন্ধনাদির উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে অনতি দূরে গহন বনে, মহান্তদেবের দর্শন লইয়া যাত্রী দলে মহা গোল উঠিল। কাতারে কাতারে সাধু দর্শনে স্ত্রী পুরুষ ছুটিল, লোকের জনতায় কাহারও অদৃষ্টে দর্শন ঘটিল, কেহ বা উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিল। রঙ্গিণী সহ মোহিনী মহান্ত দর্শনে গিয়াছিল, গৈরিকধারী মহাপুরুষ বেদীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, শিষ্য মণ্ডলি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ বাবাজীর দৃষ্টি মোহিনীর প্রতি পড়িল। গুরুদেবের লক্ষ্য হইবামাত্র কয়েক জন শিষ্য, মোহিনীকে বেদীর সম্মুখীন হইবার জন্য আকিঞ্চন করিল। ধর্ম্মানুরাগে দ্বিধাহীনা মোহিনী মহাপুরুষের সন্নিকটে অগ্রসর হইলে, স্বয়ং মহান্ত কতক গুলি ক্রিয়া কলাপ দেখাইবে—মোহিনীর নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সাধু পুরুষ কৃপা করিয়া তাহাকে সদয় হইয়াছেন ভাবিয়া, রমণী আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, কিন্তু অসংখ্য যাত্রিদলের মধ্যে মহাত্মার তাঁহার প্রতিই এ কৃপা দৃষ্টি কেন হইতেছে, সে তাহার বিন্দুমাত্র না বুঝিলেও, সহসা তাহার প্রাণ বিচলিত হইল, মুখে কোন কথা না বলিলেও, মানসিক চাঞ্চল্যে মোহিনী যে

উদ্বেলিত হইতেছিল, তাহা দর্শক মণ্ডলির কাহারও অবিদিত রহিল না। গৈরিকধারী রাধাচক্র, রাসলীলা, কৃষ্ণকেলি, রাইরাজা প্রভৃতি একে একে কত লীলার বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে তাঁহার কয়েক জন শিষ্য, গুরুদেবের ইঙ্গিতে মোহিনীকে নিভৃত স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হইল। মহান্তের এরূপ ভাবভঙ্গিতে রঙ্গিণী আর নিশ্চিন্তা থাকিতে পারিল না, ভ্রাতস্পুত্রীকে নয়নে নয়নে রাখিয়া রমণী এতক্ষণ সাধু পুরুষের অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। মোহিনীকে নয়নের অন্তরাল করা হইতেছে দেখিয়া, রঙ্গিণী তদ্দণ্ডে তাহা-দিগকে নিবারণ করিল। রঙ্গিণীর নিষেধ বাক্যে শিষ্য দল প্রথমে কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু যাত্রী মণ্ডলী সকলে এক বাক্যে সে অনুষ্ঠানে প্রতিরোধী হইলে, একে একে তাহারা সকলেই নীরস্ত হইল। মহাপুরুষ সক্রোধে রঙ্গি-ণীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, রঙ্গিণী মহান্তের ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গে উপেক্ষা করিয়া মোহিনীকে আপনার নিকটে টানিয়া লইল। মহান্তের দুরভিসন্ধির পরিচয় আর কাহারও অবিদিত রহিল না।

পর দিবস অতি প্রত্যূষে যাত্রী দল সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অগ্রসর হইল, রঙ্গিণী ও মোহিনী তাহাদেরই সঙ্গে চলিল। যথা সময়ে বন ভ্রমণ সমাপন করিয়া সকলে বৃন্দাবনধামে আসিয়া পৌঁছিল, তথায় পুন-রায় বিগ্রহাদির পূজাদি দিয়া যে যাহার বাটী ফিরিল। বলা বাহুল্য রঙ্গিণী মোহিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। মোহিনী নিঃসম্বলে বাটী হইতে বাহির হইয়া একখানি মাত্র অলঙ্কার বাঁধা দিয়া দুই শত টাকা কর্জ্জ লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল। টাকা কড়ি মোহিনী সমস্তই রঙ্গিণীর হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তীর্থের নিদর্শন জিনিষ পত্রাদি রঙ্গিণীর অভিপ্রায় মত রমণী কয়েকটী মাত্র ক্রয় করিয়াছিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

দল বল সহ মহেশ্বর চলিয়া গেল, নব্য ভৃত্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল, সুকুমারীর সংসারে পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল, এখন তাহাই বাহাল রহিল, খরচপত্র কয়েক দিবস অতিরিক্ত হইতেছিল, অর্থাগম রহিত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়ের বন্দোবস্ত হইল।

মনের উদ্বেগে মোহিনী তীর্থ পর্য্যটনে রঙ্গিনীর সহিত বাহির হইয়াছিল। ধর্ম্ম কর্ম্মে মোহিনীর মতি গতি ফিরিবার সূত্র পাতেই তাহার পশ্চিম যাত্রা হয়। বাটী ফিরিয়া মোহিনী সদানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতায় আর ভুলিল না। তাহাদের প্রবৃত্তির সহিত তাহার আর মিল হইল না। সাধু সেবায় রমণীর এক্ষণে অনুরাগ, সৎপথে থাকিয়া দৈনিক শ্রমে সামান্য উপার্জ্জন হইলেও, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভরণপোষণে দিয়া উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট ধর্ম্ম উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করিয়া সে মনের সন্তোষ লাভ করিতে লাগিল।

বিপন্নের উদ্ধার, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, দরিদ্ররঞ্জন প্রভৃতি সৎকার্য্যে সংযত থাকিয়া মোহিনী দিনে দিনে ভদ্রসমাজে পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইল। সুখ্যাতি অখ্যাতি কোন পক্ষেই রমণীর লক্ষ্য নাই, লোকের যাহাতে উপকার করিতে পারে, প্রাণপণে মোহিনী একাগ্র চিত্তে সে বিষয়ে সযত্না হইল, তিরস্কার পুরস্কার, সহানুভূতি বা উপহাসের প্রতি সে চাহিয়াও দেখে না, আপন মনে কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হইয়া দিনে দিনে মনে বল পাইল। আর চাতুরী ছলনা মোহিনীর জীবনে এক্ষণে ঠাঁই পায় না। এক সময়ে যে মোহিনী, লম্পট প্রেমিকের যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, তাহার নিঃস্ব অবস্থায় এক বারও ফিরিয়া তাকায় নাই, অনর্থক লোককে মনক্ষুণ্ণ করিয়া যে আপনাকে সুখী ভাবিত, আজ সেই মোহিনীর প্রাণ এতই কোমল হইয়াছে যে, লোকের বিপদের কথা শুনিলে, তাহার প্রাণ কাঁদে, পীড়িতের

আর্ত্তনাদ, অভুক্তের কাতর যাজ্ঞিয়ায় আর সে স্থির থাকিতে পারে না, যাহার যাহা প্রয়োজন অর্থে সামর্থে উপকার করিতে কোন অংশেই সে উপেক্ষা করে না, প্রার্থীর প্রার্থনার পূর্ব্বেই মোহিনী অযাচিত ভাবে উপকার করিতে অগ্রসর হয়, সে সদানুষ্ঠানে তাহার মান অপমান লক্ষ্য থাকে না।

মোহিনী অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনে সঙ্কল্প করিয়াছে, উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য মোহিনী যত্নবতী হইয়াছে। সংসারে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কতক লোক মোহিনীর এরূপ সুনাম দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, আর কেহ বা "বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী" ইত্যাদি শ্লেষ সূচক কটু উক্তি প্রয়োগে তাহার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে প্রশংসা নিন্দায় মোহিনীর লক্ষ্য নাই, রমণী আপন মনে আপনার দিন বুঝিয়া লইতেছে, সাধুর সহিত সদালাপে, দেব দ্বিজের প্রতি ভক্তিতে মোহিনীর ছলনাময়ী কপট হৃদয় এতই কোমল হইয়াছে যে, পরের দুঃখের কথা শুনিলে, মোহিনী ক্ষণকালের জন্যও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই দেহের উপর মোহিনীর প্রাধান্য দাঁড়াইয়াছে, দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে, সে খাদ্যেও তাহার আড়ম্বর কিছুমাত্র নাই, খেঁসার ডাইল, কাচকলা ভাতে দিয়া এক পাক হবিষ্যান্নে তাহার শরীর পুষ্ট হইতেছে; পরিধানে মোটা থান, গ্রাসাচ্ছাদনে পারিপাট্যের লেশ মাত্র নাই। বিলাসিনী আজ তপস্বিনী সাজিয়াছে!

মোহিনীর যখন মতি গতির পরিবর্ত্তন হয়, সে সময়ে বিশেষ সাবধানে তাহাকে লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। একে স্ত্রীলোক তাহাতে বেশ্যা, লোক তাহাকে কোন কটু কাটব্য প্রয়োগ করিলে বা তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে, কোন প্রকার প্রতিশোধ লইবার অবলার

শক্তি ছিল না। ভদ্র সমাজে অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইলে, লোকে অপ-রাধীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাহারই দোষ সিদ্ধান্ত করিবার কথা। এ কারণ প্রথম প্রথম মোহিনী সাধারণের সংস্রবে সহসা আসিত না, ভবিষ্যৎ জীবন যে ভাবে অতিবাহিত করিতে মনে মনে সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই ভাবেই অভ্যাস করিতেছিল। সময় ক্রমে মোহিনী এরূপ দিব্য শক্তি লাভ করিল যে,নরনারী সকলের সমক্ষে বাহির হইতে সে আর কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, বা দুষ্য জ্ঞান করিত না। মানসিক তেজে তেজস্বিনী হইয়া মোহিনী, দুষ্ট শিষ্ট:সকলের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধি দেখাইতে লাগিল।

সংসারে যে, যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, আকস্মিক তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিলে, সাধারণের দৃষ্টি তাহার উপর সমধিক আকৃষ্ট হয়; কিন্তু বারম্বার পরিবর্ত্তনে উদ্দেশ্য অটল অচল রাখিতে পারিলে, কেহ কোন কথা কহিতে বা গ্লানি করিতে সাহস পায় না। মোহিনীর অদৃষ্টে লোকের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও বিড়ম্বনার কোন অংশই অভাব হয় নাই। এক সময়ে যাহারা তাহার প্রতি অবজ্ঞা দৃষ্টিতে চাইয়াছিল, কোন প্রকার সহানুভূতির প্রার্থী হইয়া যে মোহিনী তাহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়াছিল, সময়ে সেই মোহিনীর বিপক্ষ মণ্ডলি, তাহারই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল, মোহিনী এখন প্রকৃতই লোকের মনোমোহিনী হইয়া সময়ের সার্থকতা সাধন করিল। এখন মোহিনীকে সকলেই ভক্তির চক্ষে দেখে, বেশ্যা বলিয়া আর কেহ ঘৃণা করে না। বারাঙ্গনা মোহিনী, কুলটা বৃত্তিতে আজীবন কাটাইলে, তাহার কথা কেহই জানিত না, আজ মোহিনীর সুখ্যাতি ঘরে ঘরে ঘোষিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রের, পিতা মাতার জীবদ্দশায়, সংসারে যে শ্রী ছাঁদ ছিল, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে একে একে সে সকলই লোপ পাইল। গৃহশূন্য হইয়া নগেন্দ্রনাথের গৃহধর্ম্মে আস্থা কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল, কর্ত্তা গৃহিণীর অভাবে সে সংসার আরও উশৃঙ্খল হইল।

তাহাতেও নগেন্দ্র আর সংসারে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, সদাশিবের উপদেশে তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় ভোগ বাসনায় বীতানুরাগী হইলেন। জীবনের অধিকাংশ কাল পার্থিব সুখ সম্ভোগে তাঁহার দিন কাটিয়াছে, সে জন্য পারের সম্বল কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইল, তখন কি উপায়ে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, পরলোকে সদ্গতি লাভ হইবে, তৎ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় অগ্রসর হইল। পারলৌকিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সদাচারে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে, নগেন্দ্রনাথ একাগ্র চিত্তে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে সংযত হইলেন।

তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, এই স্বার্থময় ভাল বাসা লইয়া সংসারের আদান প্রদান, আচার ব্যবহার। তুমি আমায় যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়া, প্রাণাধিক প্রিয়তম ভাবিয়াও যখন আমার অনুরাগ বিন্দু লাভেও বঞ্চিত হও, লোক সমাজে শত সহস্র মুখে আমার গুণ কীর্ত্তন করিয়াও, পদে পদে আমারই কৌশলে তোমায় যখন লাঞ্ছিত, অবমানিত ও তিরস্কৃত হইতে হয়, তখন তোমায় আমায় কি ভাব দাঁড়ায়? আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ অনেকের সহিতই সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মতি গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা একে একে সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে; বরদা, রমণ প্রভৃতি কাহারও সহিত তাঁহার আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু প্রতিনিয়ত যে তোমায় আমায় রক্ষা করি-

তেছে, যাহার সহায়তায় তুমি আমি সংসারী, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে অধোগতি না হয়, তৎ প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে, এমন ব্যথার ব্যথীকে যখন আমরা ভুলিয়া যাই, নশ্বর সংসারের নশ্বর মানুষ নগেন্দ্রনাথ তাহাকে ভুলিয়া সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইবে কেন? মোহে মজিয়াছিলেন বলিয়াই নগেন্দ্রনাথের উন্নতির পথ রোধ হইয়াছিল, তবে পুনঃ পুনঃ অনুতাপে, বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি বশতঃ তাঁহাকে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইতে হইল না। যে অবলম্বনে নগেন্দ্র সংসারী, যাহাকে ভুলিয়া তিনি বিপথগামী হইয়াছিলেন, তাহারই কৃপায়, শেষের দিন আসিবার পূর্ব্বেই, নগেন্দ্রনাথ তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার সাধনা কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল, কিন্তু সংসার-পথে ভ্রমণে একবার তাঁহাকে যে পদস্খলনে দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, মৃত্যুর দিন অবধি তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সম্পূর্ণ।